1951, April

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

সম্পাদক
কমলকুমার ঘটক

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

দ্বাত্রিংশ বর্ষ

—এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা—

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সভাপতি)
অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী
অধ্যাপক শ্রীসুনীতকুমার ইন্দ্র
শ্রীকমলকুমার ঘটক (সম্পাদক)
শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

মুদ্রণ—দি মডার্ণ আর্ট প্রেস
কাগজ সরবরাহ—ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

চৈত্র, ১৩৫৭ ঃঃ দ্বাত্রিংশ বর্ষ ঃঃ এপ্রিল, ১৯৫১

শ্রীকমলকুমার ঘটক কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সূচী পৃষ্ঠা

কলেজ প্রসংগ ১

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫

জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব ৭

গল্প লিখিলাম [গল্প] ১২

রবীন্দ্রনাথ ও "ধূলির ধরণী" ১৫

এক ঝলক আলো [গল্প] ২২

যে জন আছে মাঝখানে ২৭

ট্র্যাজেডী ৩১

শিকার [কবিতা] ৩৭

ধূসর সনেট [কবিতা] ৩৮

ফসিল [কবিতা] ৩৯

প্রথম ও শেষ [কবিতা] ৪২

শ্রাবণের সায়াহ্ন যূথিকা [কবিতা] ৪৩

উৎসর্গ [কবিতা] ৪৪

আমাদের কথা ৪৬

THE FAR EAST AND WORLD PEACE 1

GEORGE BERNARD SHAW 4

A GLIMPSE INTO EDUCATION IN BENGAL IN THE BEGINNING OF THE NINETEENTH CENTURY 7

WORDSWORTH: A RE-CONSIDERATION 14

ON PHILOSOPHIC REFLEXION 18

THE MEDIUM OF DRAMA: VERSE *vs.* PROSE 26

BERNARD SHAW 30

KEYNES AND MARX 32

RADAR—ITS ELEMENTARY PRINCIPLES 39

THE IDEAL OF SRI AUROBINDO 43

ALDOUS HUXLEY 47

THE SIGNIFICANCE OF BERNARD SHAW 52

A WEEK OF HISTORICAL CONFERENCES AT CUTTACK 56

THE ENGLISH SEMINAR 58

BOOK REVIEWS 58

চিত্র-সূচী

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কোপাই
রাত্রির আকাশে সূর্য্য।

Sree Aurobindo
George Bernard Shaw
Presidency College Athletic Committee (1949-50)
Presidency College Cricket Match (14th Jan. 1950)
College Union Council (1949-50)

বিজ্ঞাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য চাঁদার হার :—

ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল নিয়ে)	২৷৷০ টাকা
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—	১৷৷০ ”
ভারতের বাইরে	৪ শিলিং

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক বা কলেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে সাদরে। সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী এবং এই কলেজ ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত পত্রাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। উপযুক্ত ডাক-টিকিটযুক্ত শিরোনামা-লিখিত লেপাফা সংগে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা কাগজের একপিঠে লিখে “সম্পাদক প্রে, ক, প”এর নামে পাঠাতে হবে। রচনা সংগে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে।

পত্রিকা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদকের সংগে পত্রালাপ চলবে।

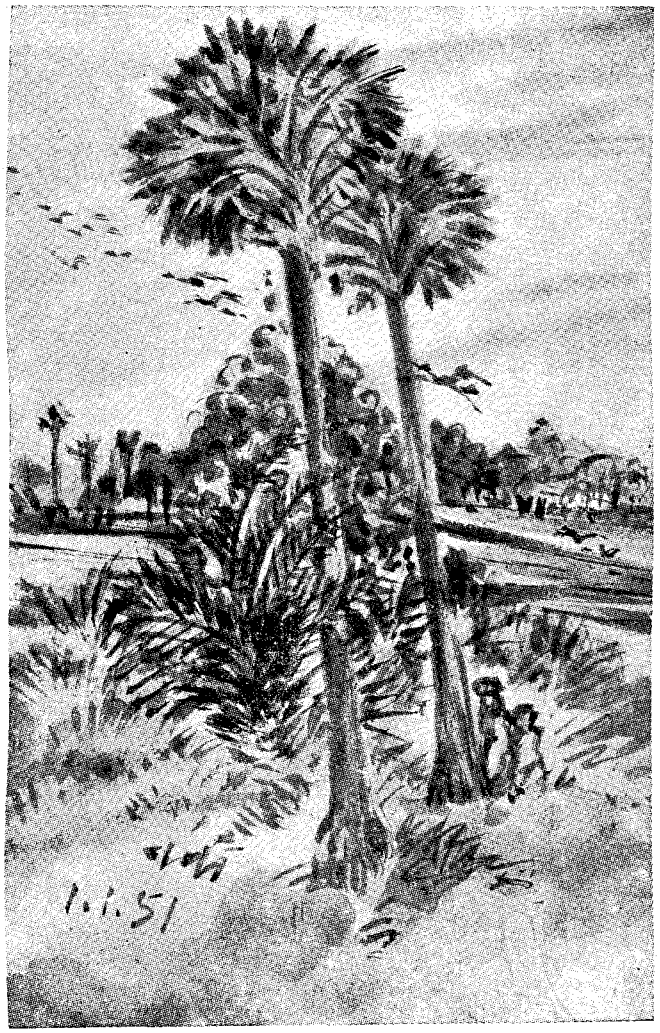

'কোপাই'

শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার ভট্টের সৌজন্যে]

শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু

রাত্রির আকাশে সূর্য্য

(টাইগার হিল্‌স্‌, দার্জ্জিলিং)

আলোক শিল্পী : বটকৃষ্ণ দে

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

মাঘ, ১৩৫৭ ঃঃ বত্রিংশ বর্ষ ঃঃ মার্চ্চ, ১৯৫১

কলেজ প্রসংগ

সম্পাদক, প্রেঃ কঃ পত্রিকা

ছাত্র ছাত্রী সংবাদ

বর্তমানে আমাদের কলেজের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১৪৮, বিজ্ঞানে ৮৩৫; আর্টসে ৩১৩। বর্তমানে কলেজে মোট ৯৯ জন ছাত্রী পড়েন। বিভিন্ন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে আমাদের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৬৭।

পরীক্ষার ফলই আজকাল অধ্যয়ন অধ্যাপনার মানদণ্ড। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধ্য পরীক্ষায় প্রথম দশটী স্থানের মধ্যে ৩টী স্থান আমাদের কলেজের ছাত্ররা পেয়েছেন। উপাধি পরীক্ষায় ইতিহাস, অর্থনীতি, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, রাশি বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, ভূগোল, রসায়ন বিষয়গুলিতে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। তা ছাড়া গণিত, ইতিহাস, রাশি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে আরও কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছেন। আমাদের কলেজের ছাত্রীরা এবার তিনটী বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বোধ হয় এই সর্ব্ব প্রথম একজন ছাত্রী—শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা—অর্থনীতিতে প্রথম স্থান পেয়েছেন। উপাধি পরীক্ষায় বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষাগুলিতে পাশের হার ভালই হয়েছে।

অধ্যাপকমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন

ইংরাজী বিভাগের তরুণ অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার সেন উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন। মধ্য কলিকতা কলেজ থেকে শ্রীপরেশনাথ ঘোষ ও সংস্কৃত কলেজ থেকে শ্রীঅমল ভট্টাচার্য্য এই বিভাগে যোগদান করেছেন। অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্থান পূরণ করেছেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। অধ্যপিক সিংহ বহুদিন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অস্থায়ীভাবে তিনি কিছুদিন অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি নানাভাবে কলেজের উন্নতিবিধানে ব্রতী ছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণে কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হোলো। এই বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন। মধ্য কলিকাতা কলেজ থেকে শ্রীভবতোষ দত্ত তাঁর স্থান পূরণ করেছেন। এই বিভাগে নতুন নিযুক্ত হয়েছেন তরুণ অধ্যাপক শ্রীতাপস কুমার মজুমদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। দর্শন বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলীতে কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইতিহাস বিভাগে নতুন নিযুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী। বাংলা বিভাগে প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছেন ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ কলিকতা চারুচন্দ্র কলেজ থেকে। গণিত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভড় আয়-ব্যয়-পঁরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। এই বিভাগে নতুন এসেছেন শ্রীমুরারি মোহন রায় চৌধুরী হুগলী কলেজ থেকে। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের যশস্বী অধ্যাপক শ্রীঅমরেশ চক্রবর্ত্তী অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্থান পূরণ করেছেন শ্রীকুলেশচন্দ্র কর। এই বিভাগে এসেছেন হুগলী মহসীন কলেজ থেকে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার শূর এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুক্ত শূর সম্প্রস্তি অবসর গ্রহণ করেছেন। সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন আচার্য্যের সিনিয়র সার্ভিসে পদোন্নতি হয়েছে। তিনি সম্প্রতি সহকারী শিক্ষা পরিচালক হয়ে বদ্‌লী হয়েছেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় লেডী ব্র্যাবোর্ণ কলেজে যোগদান করেছেন। এই বিভাগে নতুন নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য। শ্রীশিবপ্রসাদ দাসগুপ্ত ও শ্রীনিশীথরঞ্জন কর ভূবিদ্যা ও ভূগোল বিভাগে যোগদান করেছেন। শারীর বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ধর কলেজ পরিত্যাগ করায় তাঁর স্থান পূরণ করেছেন বেথুন কলেজ থেকে শ্রীঅমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে কলেজে এবার থেকে ভূগোল বিষয়ে অনার্স পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কলেজের সংস্কৃত বিভাগ সংস্কৃত কলেজে স্থানান্তরিত হয়েছে। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা দুঃখের কথা।

ছাত্রাবাস

ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসে বর্তমানে ১৭৬ জন ছাত্র আছেন। তন্মধ্যে ৭ জন মধ্য কলিকাতা কলেজের ছাত্র। স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসের ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে ৪০ জন। দুইটী ছাত্রাবাসেরই তত্বাবধায়ক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসে সহকারী তত্বাবধায়ক শ্রীসত্যচরণ বন্দোপাধ্যায়, স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য।

লাইব্রেরী—

৩১।৩।৫০ তারিখে আমাদের বই-এর সংখ্যা ছিল ৬৯,৮৭২। বর্তমান বৎসরে ১৬৮ খানা সাময়িকী নেওয়া হচ্ছে। এই বৎসর ৪৮৪৫ খানা বই কেনা হয়েছ। কার্ড ইনডেক্স তৈরী আরম্ভ হয়েছে। লোকাভাবের জন্য কাজ আশানুরূপভাবে এগুচ্ছেনা।

কলেজ পত্রিকা

গত বৎসর কলেজ পত্রিকার আর্থিক দুরবস্থার কথা নিয়েই কলেজ প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছিল। এবারও সেই প্রসঙ্গের পুনরবাবৃত্তি না করার কোন কারণ ঘটেনি; যদিও এবারের ছাত্র-সংসদ দয়া করে পত্রিকার জন্য কয়েক টাকা বেশী মঞ্জুর করেছেন। প্রেসি-ডেন্সি কলেজ পত্রিকার গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের কলেজকে যশের অধিকারী করেছে। এই ঐতিহ্য অব্যাহত রাখতে উপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দ দরকার। কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। মুদ্রণ ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বেড়েছে, বই কমেনি। 'বিতর্ক বিভাগ', 'রবীন্দ্র পরিষদ', 'নাট্য বিভাগ'—এই বিভাগগুলিতে প্রদত্ত অর্থের ব্যয় সঙ্কোচ করা অসম্ভব নয়। ছাত্র-সংসদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অন্যান্য বিভাগগুলিতে অর্থ বণ্টন সুষ্ঠুভাবে হ'লে পত্রিকার জন্য কিছু বরাদ্দ বাড়ানো হয়ত অসম্ভব হবে না।

আমাদের অভাব-অভিযোগ :—

কলেজ পত্রিকা মারফৎ প্রতি বৎসরই কলেজের সাধারণ সম্পাদক এবং পত্রিকার সম্পাদক আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সে সব কথা কর্তৃপক্ষের কানে পৌছোচ্ছে বলে মনে হয় না। কলেজের ঘর ও আসবাবপত্র দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় ঘরেই আসবাবপত্রগুলির অবস্থা শোচনীয়। অনেক সময় 'বিশেষ 'ক্লাস' বা 'অনার্স ক্লাসে'র জন্য ঘর পাওয়া যায় না। শিক্ষককে ২।৩ জন ছাত্র সঙ্গে করে ঘরের সন্ধানে বেড়োতে হয়। এ সমস্ত অসুবিধার প্রতিকার না হওয়া আমাদের নাম-করা বিদ্যায়তনের পক্ষে লজ্জার কথা। কলেজে অবসর সময়ে বিশ্রাম করার মত ঘর নেই। 'বিরাম-পীঠিকা' এত ছোট যে ছাত্রদের সাধারণতঃ আর্টস্ লাইব্রেরীতে সময় কাটাতে হয় কিংবা সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কলেজের সব ছাত্ররা

একত্র মিলিত হ'তে পারে এমন কোন ঘর নেই। কলেজে কোন বিতর্ক বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠান কিছু হ'লে Physics Theatre-এর শরণাপন্ন হতে হয়। বৎসরের পর বৎসর এ সমস্ত সম্বন্ধে লেখার পরও যদি এর কোন প্রতিকার না হয় তবে আমাদের কি উপায় আছে ?

কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের কাছ থেকে যে ৫।৬ টাকা বেশী মাইনে নেওয়া হয় তার পরিবর্তে বিশেষ কোন সুবিধা তারা পায় না। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের বিশেষ পড়ানোর কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের জন্য যে ছাত্রাবাস আছে তাতে তাদের স্থান সংকুলান হয় না। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা অবশ্য লেবরেটরী ব্যবহার করে। আর্টস্ ছাত্রদের কোন সুবিধা নেই। ইতিহাস বিভাগে সম্প্রতি স্নাতকদের ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অন্যান্য বিভাগে অনুসৃত হলে ছাত্ররা উপকৃত হবে। কলেজ লাইব্রেরীর কিছু উন্নতি হয়েছে সত্য কিন্তু অনেক বিষয়ে নতুন বই কেনার অভাবে ছাত্রদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তা ছাড়া সকালে ও সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে লাইব্রেরীতে পড়ার কোন ব্যবস্থা নাই। কয়েকজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করলেই আমাদের এ অসুবিধা দূর হতে পারে।

বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষাগারগুলির বিশেষ কোন উন্নতি হচ্ছে না। নতুন যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্রদের পরীক্ষা অনেক সময়েই নির্ভুল হয় না। ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগারগুলির যন্ত্রপাতি বাড়ানো দরকার। আর জরাজীর্ণ, যন্ত্রপাতিগুলিকে ত্যাগ করাই সমীচীন।

কলেজ পত্রিকার কাজ কর্ম্মের জন্য একটা পৃথক ঘরের দরকার। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্ত্তী সম্পাদকও লিখেছেন। অনেক চেষ্টার পর কলেজের ছাত্রপরিষদের জন্য একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। একখানা কুঠ্‌রী পেলে আমাদের কাজ কর্ম্মের অনেক সুবিধা হয়।

প্রাক্তন ছাত্র সংবাদ—

সম্প্রতি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চপদের অধিকারী হয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীশম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় আমাদের কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের নবনিযুক্ত মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস আমাদের কলেজের প্রাক্তন, ছাত্র। আমাদের কলেজের কৃতী ছাত্র শ্রীসুমলচন্দ্র সিংহ সম্প্রতি তিব্বতে ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট নিযুক্ত হয়োছন। আমরা এঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ; আর কামনা করছি এঁদের সাফল্য ও উন্নতি।

শোক সংবাদ

সম্প্রতি তিন জন প্রাক্তন অধ্যাপক—ডব্লিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, পঞ্চানন নিয়োগী ও সুবিমলচন্দ্র ঘোষাল—ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ওয়েল্‌স্, লণ্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ব

COLLEGE UNION COUNCIL

SESSION—1949-50

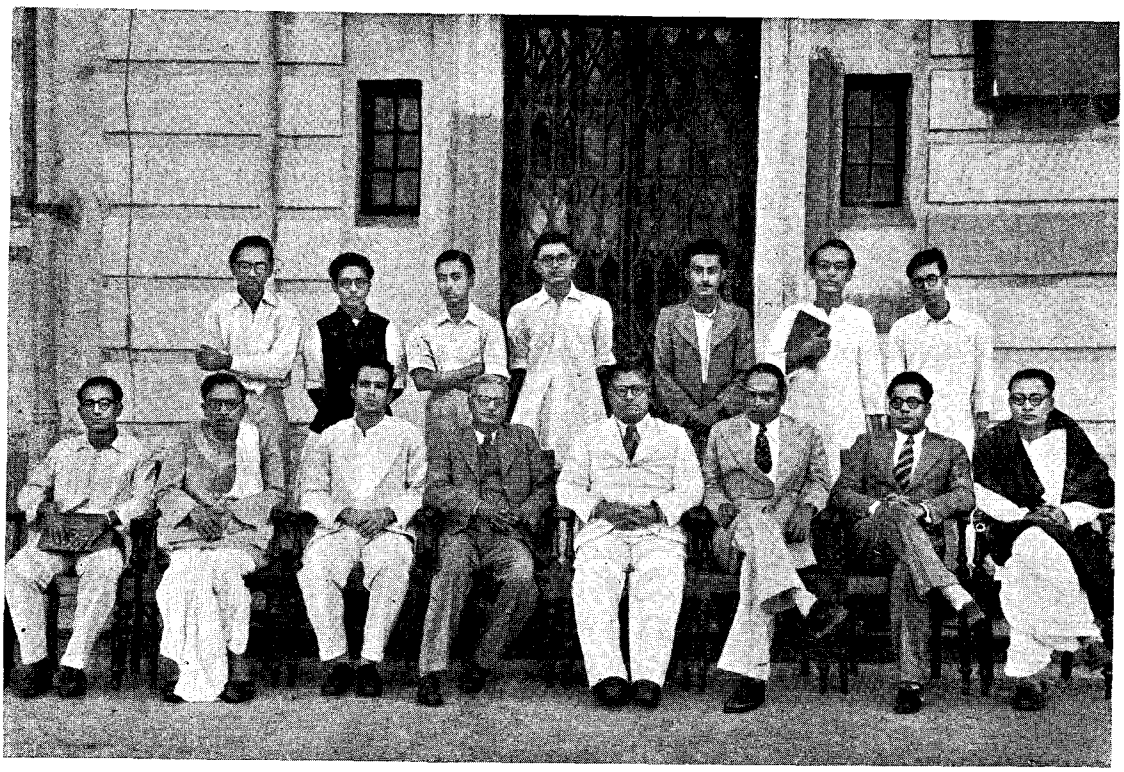

Left to Right

Sitting :—Hrishikesh Banerji (General Secy.), Dr. S. C. Sen Gupta (Chairman, Publications Section), Prof. A. W. Mahmood (Chairman Junior Common Room), Prof. G. D. Bhar (Bursar), Dr. J. Ghose (Principal), Dr. J. C. Sengupta, Prof. A. Majumdar (Chairman, Debates Section), Prof. H. P. Mitra (Chairman, Rabindra Parishad).

Standing:—Prabir Ghosh (Debate Secy.), Dipen Dutta (Drama Secy.), Amal Sen (Junior Bursar), Sourin Chakrabarty (Secretary, Publications Section), Subrata Sinha (Secy. Junior Common Room), Subrata Roy (Secy. Rabindra Parishad), Vedaprasad Sen (Secretary, Social Service League).

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

['সত্যযুগ'-এর সৌজন্যে]

বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৮ সালে ডব্লিউ, সি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হয়ে এই কলেজে আসেন। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন; এর মধ্যে তিনি অস্থায়ী ভাবে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরও নিযুক্ত হয়েছিলেন। সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। যতদিন তিনি এ দেশে ছিলেন ততদিন কলেজের প্রত্যেক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যেত এবং কলেজ পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।

স্বর্গত পঞ্চানন নিয়োগী এই কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র (১৯০৩—১৯০৭) ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে রাজসাহী কলেজ থেকে এখানে বদ্‌লী হয়ে আসেন এবং পরে রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হয়েন। ১৯৩৮ সালে অবসর গ্রহণ করে তিনি মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন এবং আমরণ ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্বর্গত সুবিমলচন্দ্র ঘোষাল অনেক দিন এই কলেজের রসায়ন বিভাগে সহায়ক ও অধ্যাপকের কাজ করে হুগলী মহসীন কলেজে বদ্‌লী হয়েন। মাত্র কয়েক মাস হলো তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

এই সব প্রাক্তন কর্ম্মীদের বিয়োগে কলেজ তিনজন বিশিষ্ট বন্ধুকে হারালো। আমরা তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য্য

বিভূতিবাবুর মৃত্যুসংবাদ প্রত্যেক বাঙালীই গভীর বেদনার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ঘাটশীলায় উপস্থিত সাহিত্যিকেরা মিলে তাঁর জয়ন্তী-উৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন। জয়ন্তী-উৎসবের মধ্যে বোধ হয় অভিশাপ আছে।

যাঁরা বিভূতি বাবুর সঙ্গে একবার মিশেছেন তাঁরাই জানেন কী সুন্দর দিলখোলা মানুষ ছিলেন তিনি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর মতো হৃদয় ও অকৃত্রিমতা কারও নেই। তিনি গল্প করতে বসলে উচ্চহাসিতে ঘর ভরে যেত, অপরিচিত আত্মীয় হয়ে উঠত, সকাল গড়িয়ে দুপুর হত। শিশুর মত সরল অগ্রজোপম এই লোকটিকে হারিয়ে আজ সত্যিই নির্বান্ধব বলে মনে হচ্ছে।

একথা ঠিকই যে আধুনিক জগৎ ও জীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মুখর পটভূমি ও তার বিচিত্র জটিলতা বিভূতিবাবুর রচনায় প্রকাশ পায়নি। আজ অর্থনৈতিক সমাজবাদ ও মনোবিকলন যুগপৎ আমাদের বুদ্ধি ও চেতনাকে দখল করেছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাচেতনতা ও বুদ্ধিগম্যতা বিভূতিবাবুর রচনায় নেই বলেই, তাঁকে সরাসরি 'পলায়নপর' বলা সংগত হবে বলে মনে করি না। আসলে তাঁর "পলায়নী বৃত্তি'ও সচেতন নয়।

গ্রাম-বন-মাঠ-নদী বিভূতিবাবুর মনকে গিঁঠাতে গিঁঠাতে বেঁধেছে। সেই মানসযোগ চেতনার যোগে পরিণত হয়েছে। তাঁর চোখে রূপের কাজল, তাই চেনা পথ,, জানা মুখও তাঁর গল্পে উপন্যাসে অপূর্ব রূপশ্রী লাভ করেছে। বিভূতি বাবু নিজে সার্থক আরণ্যক। পাহাড়-মাঠ-বনের সঙ্গে এমন পথিক-মিতালি বাংলা সাহিত্যে এর আগে কোথাও দেখিনি।

ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নিজে যেমন সাদাসিদে, অগোছালো অথচ অকৃত্রিমতায় দীপ্তিমান্, তাঁর লেখা সম্বন্ধেও ঠিক একই বিশেষণ প্রযোজ্য। তাঁর সব লেখাই যে সার্থক তা বলতে পারি না, কিন্তু তাদের বিশ্বস্তরূপটি মনোহরণ করেই। আজ যে-সব প্রশ্ন আমাদের চিত্তে সর্বদাই ঊর্ধ্বশিখ, তার উত্তর বিভূতি বাবুর রচনায় মিলবে না। কেন না তিনি দ্রষ্টা, প্রশ্নকর্তা নন। তাঁর মনের গড়নই সেই ধরনের। নাগরিক জীবনের সঙ্গেই যোগ বুদ্ধিগম্যতার, প্রশ্নকরনের। কিন্তু বিভূতিবাবুর প্রাণচেতনা গ্রামীণ ও আরণ্যক; সেখানে প্রশ্ন নির্বাক। নিসর্গ-জীবনের খোপে খোপে যে অফুরন্ত সৌন্দর্যের, রহস্যের রাজ্য, তার কবাট বিভূতি বাবুর আগে কেউ এমন করে খুলে দেখায়নি।

নিম্ন, মধ্যবিত্ত, গ্রামীণ বাঙালী জীবনের যে-ধারা মন্দগতি, যা মাঝে মাঝে আবর্ত রচনা করে আবার গতানুগতিক খাতে বহে চলে বিভূতিবাবু তারই কথাকার। তাই তাঁর রচনায় ইঙ্গিত-সংকেত-ব্যঞ্জনার, নাটকীয় চমক ও ঘটনার স্থান কম। পুঁই মাচা, উমারাণী প্রভৃতি ছোট গল্পে অথবা পথের পাঁচালী, অনুবর্তন প্রভৃতি উপন্যাসে অশ্রুসজলতার ও আবেগপ্রাধান্যের পরিচয় বেশি বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আমার কাছে উল্লিখিত রচনাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে জীবন-সত্য। গ্রাম-বাংলার-পরিচয়হীন, বুদ্ধিবিলাসী সমালোচকের মন্তব্য তাই অশ্রদ্ধেয়।

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা কবি করুণানিধানের জয়ন্তী-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে। দুজনেই নিসর্গরূপ-রসিক। বিভূতিবাবু বলেছিলেন, করুণা-নিধানের কবিতার গভীর প্রভাব তাঁর কিশোর—মনের 'পর। রূপ-সৌন্দর্য-স্বপ্নের যাদু তাঁর মনকে কি করে ছুঁয়েছিল।

বিভূতিবাবুকে নিয়ে আমর মনে একটু ব্যক্তিগত দুর্বলতাও ছিল। আমরা উভয়েই যশোর জেলার লোক। এই দুর্বলতাটুকু সগর্বেই নিভৃত মনে পোষণ করতাম। আজ সে দুর্বল স্থানটুকুই ব্যথাহত। কিন্তু সে কথা প্রকাশ্য নয়।

জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব *

(পরিবর্তিত)

শ্রীযতিকুমার সেনগুপ্ত

(দ্বিতীয় বর্ষ সাহিত্য)

'সাহিত্য' কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গেলে 'সহিত' কথাটার খোঁজ মেলে। তাই সাহিত্যের সংজ্ঞা, সাধারণভাবে এককথায় বলতে গেলে, বলতে হয়, জীবনকে সংগে নিয়ে যা চল্‌চে বা চলমান তাই সাহিত্য। ব্যষ্টিগতভাবে আমাদের এই যে বিরাট মানবজীবন, বিশ্বের গহনে-কন্দরে এর নিত্য আনাগোনা—দৈনন্দিন দুঃখ-কলহ, সুখ সংশয় ও হাসিকান্না নিয়ে গড়া এই জীবন—একদিকে রয়েছে দুর্ভেদ্য সমস্যাজাল, আর অন্যদিকে রয়েছে আশা-আনন্দ ও সুখস্বপ্ন। এই যে বহুমুখী জীবনধারা, এরই এক এক বিশেষ বিশেষ অংশ রূপ পায় সাহিত্যের পাতায়, লেখকের আন্তরিকতার তুলিতে বা কবিমনের বিশ্বস্ততায়···। এই জীবনকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার। তাই জীবনের প্রতিচ্ছবি রঙে-রূপে রঙীন হয়ে মূর্ত হয় সাহিত্যপটে। তাই সাহিত্য হচ্ছে জীবনবেদ। হৃদয়ে হৃদয়ে সহিতত্বের যে সেতু তাকেই স্বপ্রতিষ্ঠ করবার সাধনা সাহিত্যের। এই যে টাকাকড়ি-লেন-দেন,—দৈনন্দিন দিনযাপনের গ্লানি—এই নিয়েই শুধু মানবজীবনের গোটাটার শেষ নয়, এই বড়বাজারী কলকোলাহল-হট্টগোল মেশা ক্রুর-কঠিন সমস্যা-তীক্ষ্ণ জীবনকে পেরিয়েও আর একটা জীবনলোক আছে যেখানে বসে সাহিত্যের আসর, প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র অবসরের ফাঁকে ফাঁকে সৃষ্টি হয় আনন্দের অমরাবতীর। এই রসলোক-প্রাপ্তির মাঝখানে নেই কোন জটিল-ক্লান্ত খিন্ন-জীবন-আস্বাদ—এখানে শুধু ক্ষণিক বিরতি —বিরাট কালপ্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে এ জীবনের ঘাটে ঘাটে কিছুক্ষণের জন্য থামা—আর এরই ফাঁকে ক্লান্তিজর্জর মনের ক্লিন্ন-খিন্নতার অবকাশ কাটিয়ে সুরু হয় ক্ষণিকের আনন্দ-আস্বাদের পালা—নিজের জীবনকাব্যকে আদর্শমণ্ডিত করবার যুগজয়ী একটা সাধনার অনুপ্রেরণা। এই যে প্রতিদিনের কর্ম্ম-অবসরের ভিতর দিয়ে দিনগুলো একঘেঁয়ে সুরে কেটে যাচ্ছে, এর মধ্যে মনের খোরাক জোটাবার অবসর অল্প। তাই বিচিত্রতার আনন্দ-পরশ-উন্মুখ মন নিয়ে যে মানবজীবন, সে চিরচঞ্চল ও চির-উদ্‌ব্যস্ত হয়ে খোঁজে কি এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময় জগতের পরিবেশকে। তাই সে চিরবিদ্রোহী। তাই একঘেয়েমি-ক্লান্ত জীবনের মাঝে থেকেও সে ধরতে চায় একটা আদর্শের (Archetype) সুর,—একটা চলার আদর্শ গতিচ্ছন্দ—চলার শেষে যা তাকে দেবে

* (ভ্রাতৃ-সংঘে'র পরিচালিত ২য় বার্ষিকী প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

পরিপূর্ণপ্রশান্তি ও আদর্শমহিমা। এই রকম জীবনাদর্শের অনুসন্ধিৎসায় যুগ যুগ ধরে মানুষ খুঁজে খুঁজে ফিরেছে পর্বতে, গুহায়, বা উপদেশবাণীতে—যেটা ছিল কিছুটা অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক বা হয়ত সাধারণ জীবনবিরোধী একটা দুশ্চর-কঠোর দেহ তপস্যা-মণ্ডিত···এম্‌নি করে ব্যর্থ হয়ে খুঁজে খুঁজে ফেরার শেষে সাক্ষাৎ মিলেছে। সাহিত্য-লোকের—জীবনাদর্শের—সুরু হয়েছে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'র-ও জয়গান—। তাই সেই আদি-যুগের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে মিলবে সেই সমাজ ও জাতীয়-জীবনের প্রতিভাস, সেই জীবনাদর্শ খোঁজার উদগ্র প্রেরণা। কারণ, মানুষ তখনও স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারেনি, নিজের জীবনের অনিশ্চয়তার সম্ভাবনায়, তখনও সে ভীত-কম্পিত ও অসহায়। তাই তখন সমগ্র জাতির জীবন ব্যর্থ হয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরেছে সেই নিশ্চয়তার সুরটিকে ধ'রতে, যার মাঝে সে হয়তো খুঁজে পাবে তার অন্তর রহস্যের আপাত সমাধান, মিলবে তার আশংকার ক্ষণিক নিবৃত্তি।

তাই সে-যুগের সাহিত্যসৃষ্টি কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল, ধর্ম-উপধর্ম ও দেবদেবীদের সংকীর্ণ গণ্ডির আওতায়। তাই বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজতে গেলে মিলবে চর্যাপদ, মংগলকাব্য ও নাথসাহিত্যে ধর্মের জয়গান ও জীবনধারণের অনুশাসন বা সেই ঊর্ধ্বলোকবাসী দেবদেবীদের আদর্শ জীবনোদ্দেশ্যে মূক-অসহায় মানুষের প্রকম্প প্রশস্তি-বাণী। তাই তখন দেবদেবীর মহিমা-কীর্তন-সংস্তুতির কাছে বাতিল হয়ে গেছে ধূলোর জগতের সাধারণ মানুষদের সেই সুখদুঃখ ও কান্নাহাসির কথা। সেই অসংখ্য দেবতার আড়ালে ঢাকা পড়েছে সেদিন মানুষের বাস্তব জীবন ও সমাজের মূর্তিখানি। তাই সে-যুগের সমাজও গড়ে উঠেছে ওই দেবদেবী মহিমার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে। মানুষ তাই তখন স্বপ্ন দেখেছে ধর্ম-উপধর্মের আবহাওয়ায় নিজেকে বা নিজের জীবনকে গড়ে তোলবার, বা সেই অলোকসামান্য দেবদেবীদের উপাসনা-স্তুতি বা মাহাত্ম্য-স্তব-ধ্যান করে নিজের জীবনকে সেই আদর্শের পথে নিয়ন্ত্রিত করবার; তাই সেদিনকার গোটা জাতির জীবনেতিহাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে দেবদেবীরা—তাদেরই মংগলকথা, বা কাল্পনিক-বা-অকাল্পনিক চরিত্রকথা, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মানুষের বুভুক্ষু সকরুণ প্রার্থনা—"যশো দেহি—দ্বিষো জহি···" সেই দাও দাও শব্দ বা সেই—"নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ!" এর অসহায়-প্রার্থনা-আবেদন এই সব আকুল প্রার্থনা ও স্তব-স্তুতিবাদের মাঝ দিয়েই আবর্তিত হয়েছে তখনকার সমগ্র মানবজীবন। আর পিছনে পিছনে কাজ করেছে মংগলকাব্যের সেই আশাবাদের উদ্গান—মানুষকে বাঁচতে হবে দেবতার অনুকম্পা নিয়ে, তাদের আদর্শ-আশীর্বাদে গড়ে তুলতে হবে নিজের জীবনকাব্য।

তারপরের অধ্যায়ে, বৈষ্ণব কবিতা-ধারায় সাহিত্যের নূতন সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সত্য, তবু তখনও কিছুটা ধর্মের গণ্ডির মধ্যেই তার আনাগোনা ছিল সীমাবদ্ধ, তাই কিছুটা বিবর্তনের ঢেউ এলেও জাতীয় জীবনের গোড়ায় ছিল যে ধর্ম-ভীরু, আশংকা-

আকুল, কম্পিত-ভীত মানবহৃদয়; সে তার দেব-ভীতি-আশংকার গণ্ডি কিছুটা কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লো উদার ধর্মক্ষেত্রে। ভীতি-আশংকা কাটিয়ে হৃদয়ের অনাবিল অকপট প্রেম স্থান পেল জাতীয় জীবনের শীর্ষে—। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' তাই সেই যুগের জাতীয়-প্রেম-জয়ধ্বনির মূল কথা। এম্‌নি করে আদি থেকে অন্ত অবধি বেদ-উপনিষদুত্তর যুগ থেকে সমগ্র সাহিত্যধারার প্রতিচ্ছবি প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে যুগে-যুগে-বদ্‌লে-উঠা-জাতীয় জীবনে। তাই অলৌকিকতা, অতীন্দ্রিয়তা বা দেবমহিমা-গান থেকে সুরু করে যতই সাহিত্যসৃষ্টি নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের আশা-আনন্দের খাতে, জাতি হিসেবে ভারতের সমগ্র জাতীয় জীবনকাব্যেরও ওঠা-নামা হয়েছে সেই হারে, জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাও রূপ পেয়েছে সেই অনুপাতে। তাই রামায়ণ-মহাভারত জাতীয় সাহিত্যের একটা বড় নজির। এই মহাকাব্য দুটো শুধু কাব্য নয়, এর পেছনে সবকিছুকে ছাপিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে চলেছে সেই আদর্শপিপাসু মানবমন। তাই শ্রীরাম-যুধিষ্ঠির শুধু 'হিরো' নন, সেই বিরাট আদর্শপ্রত্যাশীযুগের প্রচ্ছন্ন প্রতীক। আর রাবণ-দুর্যোধনও যেন তেমনি নেপথ্যের জমাট অন্ধকার, যেখানে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে আত্মসচেতন মানব মন অবদমিত প্রবৃত্তি নিয়ে। সেই আদর্শের দোহাই সারা জাতীয় জীবনে। তাই ' The idea of Ravana elevates and kindles my imagination, he is a grand fellow ' বললে সে যুগে শুধু 'পাপ' হোত না, আদর্শ-প্রমুগ্ধ সমাজের চোখে বিদ্রোহবহ্নি বলে গণ্য হোত···। জগতের 'প্রায়' সকল সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে সেই একই কথা। যুগের পর যুগের অনুবর্তন হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির ধারাও এগিয়ে বাঁকের পর বাঁক নিয়ে—নূতন প্রগতির পথে—দেখিয়ে গেছে সেই আগামী সমাজকে গড়ে তোলবার স্বপ্ন, তাই পরের যুগে তারই অনুকরণ করে গড়ে উঠেছে একটা গোটা জাতীয়-কাঠামো। এম্‌নি করে যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্যের পাতায় রূপ পেয়েছে আগামী যুগের বিদ্রোহস্বপ্ন, অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবন আবাহন করে আনবার দুস্তর প্রতিজ্ঞা-বাণী। তাই দেখি একটা সমগ্র জাতির সভ্যতার অগ্রগতি-পথে সাহিত্যের অবদান কম নয়। আর শুধু কি তাই? টুর্গেনিভ-ডষ্টয়ভস্কির রচনায় যে দুর্জয় অভিযান চলেছে দিন থেকে দিনান্তরে, তাতে বাতিল হয়ে গেছে সেই জার-আমলের শোষণমূলক শাসনব্যবস্থা, ধ্বসে পড়ে গেছে সেই বিরাট স্বৈরতন্ত্রী-শাসনের ঘুণধরা-ভুয়ো বনিয়াদ। এম্‌নি করে স্খলিত হয়ে পড়েছে আমেরিকার পরাধীনতার লৌহপাশ, বা আয়র্ল্যাণ্ডের বিদেশী প্রভুত্বের বন্ধন। এম্‌নি করে সমগ্র জাতীয় জীবনের স্বাধীনতার আবাহক হয়ে এসেছে এই সাহিত্যধারা, যুগে যুগে, দেশ-থেকে দেশান্তরে। আর মানুষে মানুষে হৃদয়বোধের যে নিবিড় একাত্মতা, তারই মাঝে 'আনন্দম্' বা 'শিবম্' এর সুর মিলিয়ে—আত্মানন্দের সর্বানন্দ পরিণতির মাঝ দিয়ে সেতুবন্ধনে সাহিত্য গড়ে তুলেছে একটা সমগ্র জাতীয় মহামিলন ক্ষেত্র, যেখানে

হয়তো "সবার উপরে মানুষ সত্য" বা "নহি মানুষাৎ শ্রেয়ান্ কিঞ্চিৎ"। এম্‌নি করে যতই দিন এগিয়ে যাচ্ছে, সভ্যতার বিবর্তন হয়ে চলেছে, সাহিত্য-ধারা ও বয়ে চলেছে অগ্রদূত হয়ে—সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনকে শুদ্ধ-পবিত্র করবার দুর্জয় স্বপ্ন নিয়ে। তাই দেখি, আধুনিক যুগের সাহিত্য শুধু 'কান্তাসম্মিত' হয়ে 'গজদন্ত-মিনার-বিলাসী' বিকৃত-রুচি হীন মানবমনে আনন্দ-আসরের রস-চোলাই করেনি, কিংবা শুধু ফেনিল-আদর্শ-বাদ বা Didactic-বৃত্তি প্রচার করে মহনীয় হয়নি, এর অন্তর-অনুস্যূত হয়ে কাজ করে গেছে ঐ সমাজ ঘেঁষা 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য' "সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্"-বাদ। এই জীবনঘেরা সমাজ—যাকে চিরতরে বিসর্জন দেবার কোনো উপায়ই নেই মানুষের, তার প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ দরকার সাহিত্যিকের। তাই দেখি বিভিন্ন-বিচিত্রতার মধ্যেও একটা 'সাহিত্যিক-সুসংগতি' এগিয়ে গেছে বারংবার বর্তমান সমাজের ও সমাজবোধের ও জাতীয়-জীবনের রূপ বিশ্লেষণ করতে। তার অত্যাচার-পীড়িত ও শোষণ-পংকিল জীবনকে দিনের আলোতে চোখের সামনে ফেলে তাদের বিচারের দাবী জানিয়েছে ···। তাই দেখি, প্রথমে ঐ পাঁচালী-মংগলকাব্য-চারণ সংগীত-আদি ধর্মীয় আবহাওয়ার যুগ, সমাজছাড়া-অতীন্দ্রিয়। তারপর, টেকচাঁদ-আদি বংকিমের দল ঢেউ ফেরালেন। জীবন-উপন্যাসে মানুষের স্থান হলো। তবু, সমাজের নীচের তলার বস্তাপচা-ঠাসবুনোনির কোন পরশ নেই তাতে, কিছুটা একটানা সমাজ-ছাড়াছাড়া ভাব ···। তারপর রবীন্দ্র-শরতের যুগ। সাহিত্য নেমে এল মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় থেকে অবতরণ ঐ সর্বজনীন মধ্যবিত্ত-মধ্যশ্রেণীর জীবনে, বা ঐ আলো-আঁধারি আনাচে,-কানাচে, জগদ্দল গ্রামীণ সমাজের অলিতে-গলিতে। সমাজের অন্তরালে থেকে যে সব গ্লানিজর্জর মানুষ সমাজে স্ব-স্বীকৃতি পাচ্ছেনা, শরৎচন্দ্রের দরদভরা লেখায় তা ফুটে উঠেছে—তখনই সমাজজীবনের গহন-আঁধার গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে হাজার হাজার সমাজ-নিষ্পেষিত দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত নরনারীর মিছিল, যারা সেই মঁ-য় ভুখা হুঁর দল—চেয়ে চেয়ে ফিরছে সমাজের প্রীতি, স্নেহ ও মমতা পরশ। এম্‌নি করেই, অত্যাচার-জর্জর সংখ্যাহীন পংকিল জীবন, গুমরে গুমরে ফিরছিল যারা, তাঁরা স্বীকৃতি পেয়েছে সত্যসন্ধ-দরদী শরৎমনে। তিনিই শুনিয়েছেন, বারবার একঘেয়ে সুরেও হয়ত, এই আমাদের সুষ্ঠু-সমাজজীবনের জঞ্জাল ভেঙে চুরে নতুন প্রেমনীতিগড়া আদর্শ জাতীয় জীবন গড়ে তোলার মৃত্যুঞ্জয় সংলাপ। তখনকার সাহিত্য-ধারায় শরৎচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ-পদক্ষেপে অনেকেই হয়তো ভেবেছেন—অনর্থক আর ডাষ্টবিন-নর্দমার ময়লা ঘাঁটা কেন?...কেন আর? নিজেদেরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, সমাজ-জীবনেরই স্বস্থ-শুদ্ধি, ও পবিত্র-মুক্তির জন্য। আর কিছু নয়!···

আজ দেখি, সামগ্রিক ভাবে সারা জগতের মানুষের প্রাণে-মনে ছোঁয়াচ লেগেছে এই যুদ্ধোত্তর অনিশ্চয়তার বা এই যুদ্ধ-আসন্ন চক্রবাত্যার। উদ্‌ব্যস্ত-ত্রস্ত, অস্থির-অতন্দ্র মানব-মনে আজ শুধু আশংকা-আকুল অনিশ্চয়তার সুর। বিরাট রাজনীতিক বিপ্লব ও কূটনৈতিক

টাইফুনে ছারখার হতে বসেছে কত শত দেশ, তার শান্তি-সমৃদ্ধি—সমাজ জীবনেও এসেছে তার বিরাট প্রতিক্রিয়া—উত্তুংগশীর্ষ বিশাল সমস্যাসংকট—যুদ্ধ-শান্তি খাদ্য-সমস্যা নিত্য-নৈমিত্তিক কঠিন-কঠোর অভাব-দারিদ্র্য—একের পর এক এগিয়ে আসছে মানুষের এই স্বল্পস্থায়ী অস্থির-ক্ষয়িষ্ণু জীবনে উৎকট ক্ষয়রোগবিষ ঢুকিয়ে দিতে। বিভীষণ এই সংকটে, বিরাট যুগধারার ভাঙাগড়ার মুখে সাহিত্য আর সাহিত্যিক কি শুধু জীবনবিমুখী পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে নিজেদেরই স্বপ্নগড়া অলীক আনন্দলোকেই বিচরণ কোরবে? শুধুই কি ঐ 'খেলার মাঠে' আনন্দ-বীণার সুর তুলে তুলে জীবনছাড়া অন্তর্লোক সৃষ্টি কোরবে? না, ঐ ছন্নছাড়া পলাতক বালকের মতো সারাদিন বাঁশী বাজানো ছেড়ে ফিরবে 'এবার-ফিরাও-মোরে' ব'লে—দুঃসহতম-দুর্গমতম কাজে? বিরাট এই সব প্রশ্ন উঠেছে মানুষের মনে আজ!! সাহিত্য কি শুধুই রইবে খেলা? না, ঐ খেলার-মাঠের আনন্দলোকের সংগে যে সুস্থ জীবনময়তার—বা মংগলের সুর, সেই-সমেত? শুধুই কি 'Piping the solitary tune of life'এর দোহাই দিয়ে নির্জলা-জীবনছাড়া অভিযান চলবে? না, এই বিরাট সমস্যাকীর্ণ জীবনের 'ভুলি-নাই'-সুর সাহিত্যিকের মনোবীণার তারে বাজিয়ে তুলবে অব্যক্ত-দুঃখব্যথা-অভিশাপের 'তারা-মুদারা'?...ঐ যে এলিয়টের 'The world revolvs like ancient women gathering fuel in vacant lots' থেকে সুরু করে আজকের-কবি সুকান্তের '...ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটী' পর্যন্ত যে সুর সেটা কিসের মর্মকথা...? আজকে, ঐ যে বস্তুনিষ্ঠ প্রাণমাতানো জীবন-সুর তুলে (যদিও 'কিছুটা' Intellect বা বুদ্ধিস্তর ছোঁওয়া সেটা!) বিশ্বসাহিত্যের সাহিত্যদরবারে স্বীকৃতি পাচ্ছে ঐ 'কুলি' ওই 'গুড্-আর্থ,' ঐ কুপ্রিণের 'য়্যামা-দি-পিট্,' ঐ নিগ্রো-লেখক রিচার্ডসনের 'ব্ল্যাক-বয়,' বা ঐ লাও-চাঁঅ-এর 'রিক্‌শওয়ালা'—এদের পেছনে কি রয়েছে? শুধুই কি বিকৃত-উৎকট আনন্দতৃপ্তির প্রয়াস? যা এই বিশ্বমনের পরিতৃপ্তি-খোরাক জুটিয়েছে? না, ঐ সমাজচাপা সর্বহারা মানুষের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ—আন্তরিক দরদ যা সাহিত্যিক-মনকে দুর্দম-প্রয়াস-প্রেরণা দিয়েছে?...আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যে বিরাট ভাঙা-গড়ার উত্তাল-উদ্দাম খেলা চলছে, হাহাকার-বেদনায় প্রতীকারহীন-অক্ষমচিত্ত নির্বাক হয়ে রইছে, তা আজ সাহিত্যিকের মনের কোণে স্তূপীকৃত বস্তুজঞ্জাল হয়ে জড়ো হয়েছে,...রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা-অভিশাপ নিয়ে তাই সাহিত্যিক আজ দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ঐ কোণে, ঐ সর্বহারা-দুর্ভাগ্য নিরীহ-নিষ্পাপ 'ছায়া-মিছিলে'র, দিকে—। তাই দেখি, অভিশাপ-ব্যথাজর্জ্জর এই জীবনের বা তার কঠিন-কঠোর, তিক্ত-রিক্ত প্রকৃত-পর্যায়ের কথা বলতে গিয়ে প্রতীকারহীন চোখে জল এসেছে, তবুও ভাঙাবুকেই আশার গান শুনিয়ে যাবার প্রয়াস করছেন সাহিত্যিক, ঠিক যেমন আগের দিনে ঐ

ট্রু বাড়ুর-চারণ-বা কথক-বলিয়েরা কানে কানে বলে বলে নিষুপ্তমনে বিপ্লবজাগরণী সুর আনতো।

তাই দেখি আজ সামনের ওই পাণ্ডুর-ধূসর মরণ ছবি—
'মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রামিত মড়কের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে
মেলেনা পাদপীঠ।

গল্প লিখিলাম

(গল্প)

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
(২য় বর্ষ বিজ্ঞান)

বাড়ী ফিরিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিলাম, গল্প লিখিব। মার্কেণ্টাইল্ ফার্মে কাজ করি। দশটা-ছটা পর্য্যন্ত সপ্তাহের ছটা দিন ঘোড়দৌড়ের পর সাহিত্যচর্চ্চা মাথায় উঠিয়া থাকে আমার। তবু আজ কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছি ছাপার অক্ষরে জীবনে দ্বিতীয়বার নামটা দেখিব এই আশায়। টিফিনের ঘণ্টায় আজ অফিসে আমাদের সমিতি স্থির করিয়াছে এক ম্যাগাজিন বাহির করিবে। নরেন গুহ উপসংহারে সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে দয়া করিয়া কিছু একটা লিখিয়া আনিবার জন্য, বলিয়াছে যে সে বিশ্বাস করে এবং জানে যে, আমাদের মধ্যে সকলেরই সুপ্ত প্রতিভা আছে, আমাদেরই মধ্যে আছে কত রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কত ম্যাক্সিম্ গর্কী……! সুতরাং আমরা যেন inferiority complex-এর বশবর্তী হইয়া নিজ নিজ parts কে অংকুরেই বিনষ্ট না করি, ভাবিকালে সুবিশাল মহীরুহে পরিণত হইবার যে মহতী সম্ভাবনা ইহাতে নিহিত আছে তাহার পায়ে যেন সজ্ঞানাবস্থায় অজ্ঞানতার ভাণ করিয়া কুড়ুল না মারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং আমরাও অবিসংবাদিতভাবে তাহাকে এই ম্যাগাজিনের সম্পাদকরূপে বরণ করিয়াছি।

অতএব, ট্রামে ঝুলন্ত অবস্থায়, 'শ্রীচরণ তথা প্রাণটা বুঝি গেল' এবং ট্রাম হইতে নামিয়া, 'একটা কিছু লিখিতেই হইবে' ভাবিতে ভাবিতে সারা রাস্তা আসিয়াছি এবং বাড়ী পৌঁছিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়াই কালিকলম লইয়া বসিয়াছি।

বছর বার আগে লিখিতাম গল্প। স্কুলে বন্ধুগণ ক্ষেপাইত 'সাহিত্যিক' বলিয়া, নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিত আমার প্রতিভা সম্বন্ধে শ্রুতিমধুর সব ছড়া কাটিয়া। তবু লিখিতাম। মনে পড়ে বাবার হাতে একবার এইজন্য এক বিশাল চড় খাইয়াছিলাম, তবু ছাড়ি নাই।

মনে পড়িতেছে কলেজ ম্যাগাজিনে যেবার প্রথম নিজের নাম ও লেখা ছাপার অক্ষরে দেখিলাম সেবারের কথা। লেখাটা কতবার পড়িয়াছিলাম। বাবা ছাড়া বাড়ীর সকলকে দেখাইয়াছিলাম। কিন্তু বাবা তাহা একদিন আমার অজ্ঞাতসারে পড়িয়াছিলেন। ফলে সন্ধ্যার সময় আমার তলব পড়িয়াছিল।

যাক্ সে সব পুরাণো দিনের মধুর স্মৃতি। একটা ভাল প্লট চাই। আচ্ছা, কী লিখিব, কবিতা, না গল্প? দূর, কবিতা হইবে না, একটা গল্পের প্লটই চাই।

চিন্তার সূত্রগুলি মাথায় পাক খাইতেছে, মাঝে মাঝে জটও পাকাইতেছে, কিন্তু যাহা খাড়া করিতেছি তাহা তো দেখি নিতান্তই অনুকরণ।

আচ্ছা, ধরা যাক্, এ প্লটটা। আমারই মত একজন কেরানী, মাথার উপর সমস্ত সংসারের ভার। অফিস হইতে ফিরিবার সময় বাস হইতে পড়িয়া গিয়া পা' ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অফিস তাহাকে বিদায় দিল আর সে নিষ্ঠুর জনসমুদ্রে মিশিয়া গেল,। দূর্, একদম বাজে, ও চলিবে না।

আচ্ছা মনে করা যাক্, সে মাসের একমাত্র সম্বল ৮০ টাকা মাইনা লইয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাশে চাপিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। পথে তাহার পকেট কাটিল। বাসায় ফিরিয়া সে যখন পকেট শূন্য দেখিল, অমনি তাহার মাথার ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, সে পড়িয়া গেল এবং হার্টের দুর্বলতার জন্য সমস্ত সংসারকে কাঁদাইয়া পরলোক যাত্রা করিল।

বেশ ট্র্যাজিক্ হইয়াছে বটে। আচ্ছা, এটা আরও একটু মর্মস্পর্শী করিলে হয় না? যেমন, সে লটারীর টিকিট কাটিয়াছিল। তাহার শেষকার্য্য সমাধা হইবার পর খোঁজ পাওয়া গেল যে সে ফার্ষ্ট প্রাইজ পাইয়াছে। অথবা, ধনী পিতা তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া দিয়াছিলেন, মরিয়া সে পিতাকে চরম আঘাত হানিয়া গেল। পিতাকে পুত্র-শোকে পাগল করিলে রস আরও একটু করুণ হইবে কি?

স্ত্রী রান্নাঘর হইতে চেঁচাইয়া জানাইলেন যে আজ এখন রেশন না আনিলে কাল খালিপেটে হাত বুলাইতে হইবে।

ধুত্তোর! একটা কিছু রস যদি ইহারা বোঝে! অত সুপরিকল্পিত প্লট্টার রূপায়ণের পথে চরম বাধা দিল। কিন্তু নিরুপায়! রেশনকার্ড লইয়া থলিগুলি হস্তগত করিয়া বাহির হইলাম। গলির মুখে পানের দোকান হইতে একটা সিগারেট এক পয়সা দিয়া কিনিয়া দড়ির আগুনে ধরাইয়া ধুমাস্বাদে বিরক্ত মনের তিক্ততা অপনোদনের চেষ্টা করিতে করিতে রেশনের দোকানের দিকে যাত্রা করিলাম।

উঃ কী বিশাল 'কিউ'! দেশের লোক কিন্তু এখন রেশনিং ব্যবস্থার কল্যাণে বেশ ডিসিপ্লিন শিখিয়াছে—ঝগড়াও কম নয়। গুদামঘরে একটি বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, ধোঁয়া ও ধূলায় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে—আর কী ঠ্যালা মারিতেছে পিছনের লোকটা! লাইনটা যেন সিমেণ্ট কংক্রিটের মতই দুর্ভেদ্য।

তাহার মধ্যেই কার্ড জমা দিয়া একঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর জিনিষ পাওয়া গেল।

ধুত্তোর! কি যে হইতেছে দিনের পর দিন। রোজ বলি থলির হাতলটা সেলাই করিয়া রাখিতে, তাহা তো পারিবে না—পারিবে পাশের বাড়ী গিয়া আড্ডা মারিতে। একহাতে চাল আটার থলি হাতল না থাকিলে কী কষ্টে বহিতে হয় তা তো জানে না। ঘাড়ে চাপিয়া অন্নধ্বংসই করিতে পারিবে।

ঐ যাঃ, চিনির ঠোঙাটা ফাটিয়া গেল—চিনির দানা পড়িতে সুরু করিয়াছে। পড়ুক, আমার তাতে কি, দুদিন চা না খাইলেই মজা টের পাইবে।

অবশেষে বাড়ী পৌছানো গেল। দেহ ধূলি ধূসরিত, মন তিক্ত। তবু লুঙ্গিটা আটিয়া পরিয়া কলম আবার তুলিয়া লইলাম।

গল্পের উপক্রমণিকা লিখিলাম আপিস হইতে আনা একপিঠে টাইপ করা কাগজের অপর পিঠে। পাশের বস্তীর ঘরটাতে ধোঁয়া দিয়াছে—সমস্ত ঘরটা ধূমাচ্ছন্ন হইয়াছে, নাকচোখ জ্বলিতেছে—একটু বাহিরে না গেলে চলিবে না। চটিটা পায়ে লাগাইয়া গলির মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

'ওহে, দাও তো একটা scissors'

পয়সা দিয়া দড়ির আগুনে সেটা ধরাইয়া একটু পরে ফিরিলাম।

একী আমার কাগজগুলি গেল কৈ?

কোথাও নাই। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে রান্নাঘরে গেলাম। উনানে আগুন দিতেছে সুরমা। খোদলটাতে জ্বলন্ত আগুন, আর তাহার হাতে রহিয়াছে টাইপ করা একটি মাত্র কাগজ। আমার উপক্রমনিকার খণ্ডিত একটি অংশ।

—'ঘরে নেই কেরোসিন। ও ঘরের মেঝে গিয়ে দেখলুম কতকগুলো বাজে কাগজ পড়ে রয়েছে—তাই দিয়ে চুলো ধরাচ্ছি।' 'কেরোসিন আন' বলতে বলতে তো হয়রাণ হয়ে গেলুম।' শুনিলাম সবই, কিছুই বলিলাম না। বাহিরে আসিয়া অর্দ্ধ দগ্ধ সিগারেটটা শুধু ফেলিয়া দিলাম। বড় তিক্ত। ঘরে ঢুকিলাম, পাকানো পাকানো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়াও দেখা গেল চণ্ডীচরণ নায়কের কেলেণ্ডারটা—আজ মাসের পঁচিশে তারিখ।

একটা চাকা ঘুরিতেছে, ভীষণবেগে ঘুরিতেছে। শরীরটা কেমন অবশ লাগিল। অড়বিহীন মলিন পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া চৌকির উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

রবীন্দ্রনাথ ও "ধূলির ধরণী"

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(৩য় বর্ষ, সাহিত্য)

মাটির মানুষ আমরা—মর্ত্যের অধিবাসী। সুখে দুঃখে, ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা শ্যামলা ধরণী মায়ের সন্তান হয়ে জন্মেছি আমরা—তাই মাটি আমাদের সব চেয়ে নিকটাত্মীয়। আর এই ধূলির পৃথিবীর সঙ্গে হয়েছে আমাদের পরিচয়—সখ্যের নিগূঢ় নিগড়ে বেঁধেছি আমরা সকলকে, তাই মাটির সন্তানদের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়ে হয়েছে আমাদের দেশের মায়ের সঙ্গে ভালবাসা। পৃথিবী স্নেহে মমতায় আমাদের মায়ের স্থান দখল করেছে। তাই স্থূল দেহের জন্মদাত্রী মা ছাড়া মাটিকেও আমরা মা বলে ডেকেছি, সেই ডাকের মধ্যে দিয়ে ধরা দিয়েছে সন্তান ও মায়ের মাঝখানের ভালবাসার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই 'যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান' মানুষ সব সময়েই অনুভব করে। তাই সন্তানের দাবী নিয়ে আমরা যুগ যুগ ধরে উপভোগ করে আসছি শ্যামলা মায়ের শীতল মাতৃ-অংক। এই মাটিতে আমরা বাসা বেঁধেছি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যকার মধুর দাম্পত্য জীবন উপভোগ করেছি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ম দিয়েছি—আবার মাটির সঙ্গে ধূলো হয়ে মিশে গেছি মরণের শীতল আলিংগনে, তাই মাটি আমাদের এত প্রিয়, এর অণু-পরমাণুর মধ্যে মিশিয়ে আছে আমাদের অতীত পূর্ব্ব-পুরুষদের সুখ-দুঃখ-ভরা কত দিনের বিস্মৃতপ্রায় কত অধ্যায়, কত স্মৃতি; বর্ত্তমানের সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির কত মযুর উপাদান, আর অনাগতদের আনন্দের উৎসধারা—আশার সঞ্চারিণী স্রোতস্বিনী। রবীন্দ্রনাথ এই ধূলার ধরণীতে স্বর্গ গড়বার কামনা করেছেন, ব্যষ্টি-সমষ্টি মানবনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের সমবেত জয়গান করেছেন তাঁর কম্বুকণ্ঠে অমৃত মাখানো ছন্দে। কবির মর্ত্য মমতা রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর কাব্যের মধ্যে, যেখানে কবিগুরু দু'হাত উজাড় করে সৃষ্টির আনন্দে মত্ত। এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীকে, এই মাটির অনেক অবজ্ঞাত মানুষকে মহিমা ও গৌরবের জয়টীকা ললাটে এঁকে দিয়ে স্থান করে দিয়েছেন মানুষের ঈপ্সিত বিশ্বের দরবারে। মর্ত্যের প্রতি এই যে স্বাভাবিক টান, এই যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভালবাসা তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট কাব্যের মধ্যে অন্তহীন অসীমের পথে যাত্রা থেকে তাই বার বার ফিরে এসেছেন এই "ধরণীর মহাতীর্থে।"

সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে কবিগুরু এক স্থানে বলেছেন, "আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা

করেছি মুক্তিকে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে···।" কাব্যের মধ্যে এই মানব ও মর্ত্য-প্রীতিকে রূপায়িত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কোন দেশের বা সাহিত্যের দ্বারে হাত পাত্‌তে হয় নি। ভারতের ঐতিহ্য এবং আদর্শই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে এই ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাটির মায়ের বাহ্যরূপ ও লীলা কীর্ত্তন মাত্র করেছেন তা নয়,—মাটির মাঝে তিনি স্বর্গীয় পবিত্রতা, তার নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যবেষ্টিত আত্মীয়রূপকে খুঁজে পেয়েছিলেন—তার প্রতি মমতায় তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। এইটাই তাঁর মর্ত্য মমতার একটা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিকে কবি নানা-ভাবে উপলব্ধি করেছেন, কারণ, "মাকে মা বলিয়া সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া কবি তেম্‌নি আপনার কবিতাকে সার্থক করেছেন।"

গীতাঞ্জলির এক স্থানে কবি গেয়েছেন,

"আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবা পানে।
স্থান করে দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নীচে সব চেয়ে নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য হয় না দিতে।"

কবি তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে কামনার রসে সিক্ত করে আমাদের "ধরার মাটিতে" "সকলের মাঝখানে" তাঁর আসন পাত্‌তে চেয়েছেন। তাই এ মাটিকে লক্ষ্য করে কবি আপন মনে গেয়েছেন,—

"ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বমায়ের, তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা।"

কারণ কবি বলেন যে,

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

এই মায়ের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যলীলায় মগ্ন কবির প্রাণ তাই "উল্লাস ভরে" কতবার গেয়ে উঠেছে। তাই 'ছিন্নপত্রে'র এক স্থানে কবি বল্‌তে পেরেছেন, "ওই যে মস্ত বড় পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর ওই গাছ-পালা, নদী-মাঠ, কোলা-হল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত-সন্ধ্যা, সমস্ত শুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।" এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ার সাথে আমাদের অনেক দিনের পরিচয়; সে পরিচয় যুগ-যুগান্ত ধরে' চলে আস্‌ছে মানুষের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে—এই পরিচয় আরম্ভ হয়েছে জন্মের সঙ্গে, আর পরিচয়ের শেষ অংকে যবনিকা টানবার ভার আছে 'মরণ-বন্ধু'র হাতে।

কবি মাটি-মায়ের মুখ-নিঃসৃত কথার মধ্য থেকে রূপকের সাহায্যে একটা সত্য আবিষ্কার করেছেন যেখানে পৃথিবী দুঃখ করে বলছে,—"আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে; আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।" বিশ্ব-মায়ের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যে তাই কোথাও গলদ নেই—সবটাই মায়া মমতায় ভরা, মায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। জগতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তাই মানুষের জীবনে আনে ছন্দ আর মাধুর্য্য। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার গূঢ় একটা প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত যে অশ্রান্তভাবে ঝিরি ঝিরি রবে প্রবাহিত হচ্ছে তা মহাকবির সূক্ষ্ম অনুভূতিময় হৃদয়-বীণার পরতে পরতে ঝংকার তুলেছে—আত্মমগ্ন কবির মুখ দিয়ে তাই বেরিয়ে গেছে,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে অমি বাঁচিবারে চাই।"

সুন্দর ভুবন ও মানব—বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব—এই দুই-ই কবির কাছে সমান প্রিয়।

কবি এই পৃথিবীরূপ পান্থশালায় যেন ক্ষণেকের অতিথি—বিশ্রাম লাভের আশায় উপস্থিত হয়েছেন সেখানে, বাইরের বিস্ময়-বিমুগ্ধ জগৎ তার অপরূপ লীলা-বৈচিত্র্য অনন্ত ডালায় সাজিয়ে অনাদি কাল থেকে প্রতিদিন ঠিক তেম্‌নি ভাবেই মানুষের চোখের সামনে দেখা দেয়—তার পারিপার্শ্বিকের অবস্থান সম্বন্ধে সে যখন অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, আত্মভোলা কবি তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন—মিশিয়ে ফেলেন নিজেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভূতিময় সত্তার সঙ্গে। সেই সময়কার স্মৃতি কবির জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে। তাই কবি 'ছিন্নপত্রে'র একস্থানে বিশেষ করে সেই সমস্ত দিনগুলোর কথা স্মরণ করে লিখেছেন,—"প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি এই যে, আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আস্‌ছে, কোনটি পূর্ণিমার জ্যোছনা'র সাদা ফুলের মত প্রফুল্ল। এগুলি আমার কম সৌভাগ্য, একথা ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।" তাই কবি এই বহুরূপী মাটির মাকে "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" মনের মত করে গড়ে তুলেছেন—তাকে নবরূপে উজ্জীবিত করে তোলবার সাধনা করে গেছেন জীবনভোর, এই পৃথিবীকে তিনি স্পন্দনে, নিঃশ্বাসে, উচ্ছ্বাসে, ভাবে ও আভাসে চিরজীবন উপভোগ করে গেছেন। তাই তিনি বলেছেন, "এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটা আন্তরিক বাৎসল্যের ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেইটে ভাল করে প্রকাশ করি।" এই পৃথিবীর হৃদ-পিণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, তাই এই বাস্তবের মাটি, এই পৃথিবী অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। এমন কি তিনি 'বিশ্বদেব'কে স্বদেশের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করতে দেখেছেন—

"হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে
হেরিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছো ওগো বিশ্ব-দেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।"

তিনি এই "দরিদ্রা" স্বদেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন। তাই 'ছিন্নপত্রে'র এক স্থানে প্রশ্ন করেছেন—"মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সমস্ত ধন পেয়েছি, এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম?" তাই স্বর্গকে তিনি কামনা করেন নি—তিনি মাটির মাকে সুখে দুঃখে, এবং আনন্দ ও ব্যথামিশ্রিত বৈচিত্র্যময় জগৎকে নিবিড় ভাবে হৃদয়ের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। তাই দেখি "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটিতে মাতৃভূমির প্রতি তাঁর মমতায় ব্যাকুল কণ্ঠস্বর—

"থাকো স্বর্গ হাস্য মুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি……"

পৃথিবী যে স্বর্গ নহে, এজন্য কবির কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নেই, কারণ তিনি বেশ জানেন—

"যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি।"

তাই তিনি "ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি"র মায়া কাটিয়ে মুক্তি চান না।

পৃথিবীর সবাকার সুখ-দুঃখের তিনি সমান অংশীদার। তাই না কবি বলতে পেরেছেন,

"জন্মেছি যে মর্ত্য কোলে ঘৃণা করি' তারে
ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে।"

এর কারণ কবি অবশ্য দেখিয়েছেন "আরোগ্য" গ্রন্থের শেষ কবিতাটিতে—

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।"

'ছিন্নপত্রে'র এক স্থানে কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর ধরণীর ধূলি-মাটির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের কথা,—"এই পৃথিবীটা আমার অনেক দিনকার, এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নূতন; আমাদের দু'জনকার মধ্যে একটা খুব গভীর ও সুদূরব্যাপী চেনা শোনা আছে—আমরা দু'জনে একলা মুখোমুখি করে বস্‌লেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।" তাই তিনি মাটির মায়ের অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, জগৎ-সৃষ্টির রহস্যের মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন কতবার,

যাত্রা করি মানবের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রাণের আলোক
আয় মাগো, যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্‌ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।"

তাই মাটির মাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করেছেন,—

"ধন্য রে অনন্তকাল, ধন্য আমার ধরণী,
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর তারকা হিরণ বরণী।"

সেই জন্যেই কবি ভাল বেসেছেন এই ধরণীকে,—

"আমি যে ভাল বেসেছি এই জগতেরে
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে।
* * * * *
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর
আমার ভুবন।

ভালো বাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।"

কবি 'বলাকা'র একস্থানে জিজ্ঞাসা করেছেন "স্বর্গ কোথা জানিস্ কি তা' ভাই?" এর উত্তরও কবি অন্য একটি কবিতায় দিয়েছেন যেখানে কবি ভগবানকে বলছেন যে,—

"তুমি ত গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার।
* * * * *
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

তাই তো কবি দেখেছেন "স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি মায়ের কোলে।" স্বর্গ দেবতাদের আবাসস্থান—সেখানে হয়তো অবিচ্ছেদ্য সুখ, অবিচ্ছিন্ন আনন্দধারা আছে—কিন্তু সুখের মাধুর্য্য কি সেখানে পাওয়া যায়? যে সুখের বৈচিত্র্য নেই, যে সুখের নেই কোন বিশেষত্ব, সে সুখকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু মানব মন চায় পরিবর্ত্তন, বৈচিত্র্য, বৈষম্য এবং তারতম্য—তাই একটানা কোন জিনিষকেই সে চিরকাল আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না এবং চায়ও না। তাই পৃথিবীতে সুখের সহিত দুঃখ, ব্যথার সহিত আনন্দ আছে বলিয়াই সুখের এত মাধুর্য্য। যেমন অন্ধকার না থাকলে আলোর নেই কোন সার্থকতা, নেই কোন অর্থ, তেমনি বিচ্ছেদ ব্যথা আছে বলিয়াই পার্থিব স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা এত মধুর ও লোভনীয়। তাই ত কবিগুরু বলেছেন—"বিচ্ছেদেরই ছন্দ লয়ে, মিলন ওঠে পূর্ণ হয়ে।" কিন্তু স্বর্গে দুঃখে সমবেদনা নেই, কেহ কাহারও "স্বর্গ হইতে বিদায়" লওয়ায় বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করে না। তাই না কবি বলেছেন—"স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা, দুর্ব্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মত এমন আপনার ধন কোথা থেকে এনে দিত।... এই জন্যে স্বর্গের উপরে আড়ি করে আমি দরিদ্র মায়ের ঘর বেশী ভালবাসি।" এই কল্পিত স্বর্গ কবির কাছে যখন "ফাঁকির ফাঁকা ফানুস" ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন এই ধরণীর বুকে জন্মাবার সৌভাগ্যে তিনি খুব গর্ব্বিত ছিলেন—

"কত যে যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলা মাটির মানুষ।"

কবি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন এই ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণাকে, তাই এই মাটির দেশের মানুষেরা যখনই মরণের আশঙ্কায় আকুল হয়েছে, যখনই মরণ যজ্ঞে ক্ষেপে উঠে হোতার আসন গ্রহণ করেছে, তখনই বিশ্ব কবিকে মর্ম্মাহত করেছে। এই যন্ত্র-সভ্যতার চক্রাবর্ত্তে পড়ে মানুষেরা যেন মাটি আর প্রকৃতিকে ভুলতে বসেছে। মাটির

ওপরে সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভালবাসা জন্মিলে ও থাকলে "সভ্যতানাগিনী" ভয়াবহ যুদ্ধের রূপ ধরে কুটিল চক্র তুলতে পারবে না। তাই পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি ভাষায় ও বক্তৃতায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে নিন্দা করেছেন।

আশী বৎসরের উপর পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের বিনিময় হয়েছিল। হঠাৎ শ্রাবণের এক মেঘমেদুর মধ্যাহ্নে রাখী পূর্ণিমার দিন হৃদয়ের সব বন্ধন, নাড়ীর সব টান ছিন্ন করে, সমস্ত "দেনা-পাওনা" চুকিয়ে কবি যাত্রা করিলেন অজানা অনন্তের পথে সেই চিররহস্য-কুহেলীঘেরা দেশের উদ্দেশ্যে "বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" এই দেশ আর এই পথের সঙ্গে মাটির দেশের সন্তানদের নেই কোন পরিচয়। তাই তাঁর বিয়োগ-ব্যথায় মূক হয়ে গেল প্রকৃতি ও পৃথিবীর রসনা,—

"কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'।"

কিন্তু এত ভালবাসা, হৃদয়ের এতদিনের বিনিময় সবই ব্যর্থ হোল—

"তবুও সময় হোল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।"

কারণ মাকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে—

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে, আলোকে আলোকে।[১]

আসন্ন চিরবিচ্ছেদের শেষ সময়ে কবি কামনা করে গেছেন—

"আবার যদি ইচ্ছে কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা
মাটির পরে করি খেলা
* * *
নূতন প্রেমে ভাল বাসি
আবার ধরণীরে।"

তাই যাবার সময়ে মাটির-মাকে শেষ প্রণতি জানিয়ে গেছেন,—

"আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথ্বী
শেষ নমস্কারে, অবনত দিবাবসানের বেদী মূলে।"

শেষ বিদায়ের পূর্বক্ষণে মহাকবি ধরণীর ধূলির পবিত্র তীর্থরেণু জয়তিলকরূপে ললাটে ধারণ করে ধরিত্রীর পায়ের তলায় শেষ প্রণাম রেখে গেছেন—

"এই তীর্থ দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণাম খানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা দীপ মুখে
সে আমার নিবেদন।
* * *
তোমাদের সবারে প্রণাম।"

এক ঝলক আলো

শ্রীমনোজ কুমার পাল
(চতুর্থ বর্ষ বিজ্ঞান)

চায়ের পেয়ালায় লিকার ঢালতে ঢালতে জানালাপথে বাইরের রাস্তায় তাকাল কার্ত্তিক। বিকেলের ছায়া নেমেছে। প্লেট আদান প্রদানের ছোট গবাক্ষপথে চোখে পড়ল ওদিকের ঘরটায় জ্ব'লে উঠেছে উজ্জ্বল টিউবআলো দু'টো। নির্দ্দিষ্টকোণে চেয়ারে ব'সে সকলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ক'রছেন তার মনিব। সামনে টেবিলের উপরে সিন্দুর-চন্দনলেপা হাতবাক্স। একটা সিগারেটের খালি টীনে খুচরো আনিদুয়ানী। একটা লিলি বার্লির কৌটো ভর্তি মসলা। ঘোড়ার খুরের মত প্রকাণ্ড একটা চুম্বক। এদিকের কোণে সেই আধবুড়ো ভদ্রলোকটি রোজকার মত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ প'ড়ছেন, কাগজের নামটা কার্ত্তিক রোজ পড়ে—'সত্যযুগ'। মাঝখানে বেঞ্চিটার দু'দিকে চেয়ার টেনে ব'সে আড্ডা দিচ্ছে একদল ছোকরাবাবু। একপাশে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঘাড়ে একজন কাট্‌লেট্‌ খাচ্ছেন সাগ্রহে, আর মাঝে মাঝে গোঁফ কামড়াচ্ছেন। কার্ত্তিকের হাসি পায়।

—'দু'কাপ চা, দু'টো ভেজিটেবুল।' ওদিক থেকে চেঁচিয়ে তাগিদ দেয় গণশা।

এ ঘরটায় অন্ধকার কাটে না যেন। রেসটুরেণ্টের কীচেন। দু'টো উনুনের ধোঁয়ায় ছাদটা কালি হ'য়ে গেছে। চল্লিশ পাওয়ারের বাতিটা জ্বলে মিট্ মিট্ ক'রে। একটা উনুনের চায়ের জল চাপান। সুবৃহৎ কেটলিতে লিকার তৈরী আছে। এদিকের উনুনটায় মাংস রান্না হ'চ্ছে। এককোণে বেঞ্চির উপরে বারকোষে কিছু তৈরী চপ-কাট্‌লেট্। একটা ছোকরা রান্নাঘরের মাঝখানেই কাঁটাছুরি ধুয়ে যায় অনবরত। ধোয়ার প্রণালীটা অত্যন্ত সহজ। একবালতি জলে চুবিয়ে তোলা শুধু। যতক্ষণ না জলের রংটা হলদে হ'য়ে আসে, জল বদলাবারও প্রয়োজন নেই। প্রথম প্রথম এ ব্যবস্থায় মন খুঁত্‌খুঁত্ ক'রত কার্ত্তিকের। সে নিজের ঘরে যে বাসনপত্র ব্যবহার করে তাও ত' এর চেয়ে পরিষ্কার। এখন কিন্তু মনে হয়, এই যথেষ্ট করা হচ্ছে।

মোটর বাইক একখানা থামল বাইরে। সেই মোটাবাবু এলেন। রোজকার খ'দ্দের। সঙ্গে মোটাসোটা বেঁটেগড়নের গোলগাল মুখ মেয়েটি। বাঁ হাতে ছোট্ট ঘড়ি—আছে কি নেই ঠাহর হয় না। ডান হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। মাথায় সিঁদুর নেই। গায়ের রংটা কাল। বেশ লাগে কার্ত্তিকের।

—'কিরে, মদনা, তোর পর্দার ব্যবস্থা আর হ'বে কবে, বুড়ো ভাদ্দরে? কি বলিস, হ্যাঃ?' শরীরের বহরমাফিক গলা। কার্ত্তিকের বাবুর নাম মদন—মোটাবাবুর ইয়ারদোস্ত লোক। তুই তোকারী চলে। আশেপাশে দু'একটা রেষ্টুরেণ্ট পর্দাফেলা খোপ দেখেছে কার্ত্তিক। বেশ লাগে। অথচ মোটাবাবুর কথাটা তার মনিব কানেই তোলেন না।

—'বল না দুটো কাট্‌লেট, দু'কাপ চা। কাঁচা টাকা কামাচ্ছিস খুব। চিনতেই পারিস নে। কি বলিস, হ্যাঃ?' মোটাবাবুর অর্ডার। কার্ত্তিক চা ঢালতে শুরু করে।

ঘরের পিছনদিকের জানালাটা খুলে গা ঘেঁষা যে বাড়ীটা চোখে পড়ে ও বাড়ীতে থাকেন কার্ত্তিকদের এক বাঁধা খদ্দের। সৌখীন বাবু। অতবড় বাড়ীটায় থাকেন একা। পিছনের জানালা দিয়ে কার্ত্তিকদের রান্নাঘরের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক বেলের কানেকশান ক'রে নিয়েছেন ভদ্রলোক। ঘরে ব'সেই সুইচ্ টিপে মর্জ্জিমাফিক অর্ডার দেন তিনি। রোজ সন্ধ্যেবেলায় মাংস আর কাট্‌লেট্ তাঁর বাঁধা। এ ছাড়া তাঁর খাতিরে আরও একটা জিনিষের ব্যবস্থা ক'রতে হ'য়েছে কার্ত্তিকের মনিবকে। ব্যাপারটা কার্ত্তিক ছাড়া আর কেউ জানে না।

আরও একটা জানালা আছে এ ঘরে। সেটা রাস্তার দিকে। ও জানালাটা প্রায় বন্ধই থাকে। খুললে মনিব অসন্তুষ্ট হন। তবুও কার্ত্তিক এই বিকেলের দিকে খোলে জানালাটা একটু আধটু।

রাস্তার ওপারে উকিলবাবুদের বিরাট লালরঙের বাড়ীটার ছাদের আলসের নীচে নিভৃত আশ্রয়ে আজও ব'সে আছে একজোড়া পেঁচা রোজকার মত। উকিলবাবুর ডানপিটে চতুর্দ্দশী মেয়েটা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ছাদে। মেয়েটিকে বড় ভয় করে কার্ত্তিক। মাঝে মাঝে বিকেলে ছাদে মেয়েটাকে বন্দুক হাতে বেড়াতে দেখেছে সে। গণশা হাসে, বলে ওটা বন্দুক নয় এয়ার গান। বড়জোর পাখ্‌পাখালি মারা চলে। তা হ'লেও আগ্নেয়াস্ত্র ত'। মেয়েছেলের হাতে। ও মেয়ে ত খুন খারাপিও ক'রতে পারে। কার্ত্তিক দিব্যচোখে দেখে মেয়েটার বিয়ে হ'য়েছে। রূপকথার বইয়ে সর্পকন্যার গল্প পড়া আছে তার, নিশুতি রাতে বাসর ঘরে ওর নাকের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া ঝক্‌ঝকে—সাপ নয় ত'—একজোড়া তলোয়ার। মেয়েটা নিজের হাতে বসিয়ে দিল স্বামীর গলায়। রক্ত ঝরছে ফিন্‌কি দিয়ে। ওর মুখে খলখল হাসি,—পিশাচী!

'চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ।' একটা কর্কশ চীৎকার তুলে উড়ে গেল পেঁচা দু'টো, মেয়েটা ঘুড়ি গোঁৎ দিয়ে ফেলেছে ওদের গায়ের উপরে। হাসছে ও আল্‌সে ধ'রে ঝুকে প'ড়ে। এই একটা অদ্ভুত খেলা আছে মেয়েটার। পেঁচা দু'টোকে উত্ত্যক্ত করে ও কি আনন্দ পায় কে জানে?···

—'একটা কোব্‌রেজী দু'পিস্ রুটী।' চেঁচায় গণশা।

—'বেচা, চট্‌পট্ নে দিকিনি। একটু জোগাড় দে, কোব্‌রেজীটা ভাজতে হ'বে।' বেচারাম প্লেট ধোয়ার ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজের তালে তালে একটা সিনেমার সুর ভাঁজছিল, কার্ত্তিকের কথায় হাত চালাতে শুরু ক'রল। গানের সুরটা দ্রুতগতি হ'ল।

কড়াইয়ে গরম দালদা ঘিয়ের উপরে কার্ত্তিকের মুখের ছায়া প'ড়ছে। ছায়াটা কেঁপে কেঁপে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কেমন যেন ব'দলে যাচ্ছে। কাণে কাণপাশা। কড়ায়ের তলায় তরলপদার্থটুকু শুকিয়ে গেল যেন। কার্ত্তিক রুটী ভাজছে। খোলার ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ছোট্ট কাঠের পিঁড়িতে ব'সে একহাতে বেলা আর ভাজা। অসুবিধে হয়। অনেকক্ষণ দেখে দেখে বলে লক্ষ্মী,—'দেখি, সরো দিকিনি। ময়দাটা ভাল ক'রে মাখ-তেও পার নি? আমি বেলে দিই। তুমি ভেজে তোল।'

অযাচিত আত্মীয়তায় মনটা ভ'রে যায় কার্ত্তিকের। সারাদিন দু'টো উনুনের সান্নিধ্যে থেকে এই রাত্তির ন'টায় ঘরে ফিরে দু'চোখের পাতা বন্ধ হ'য়ে আসে যেন, নেহাৎ নিজের পেটের ব্যবস্থা, তাই। ন'ইলে সে এসেই শুয়ে প'ড়ত। মেয়েটাকে বেশ লাগে তার। পাশের ঘরটায় থাকে ওরা।

—'আচ্ছা, নক্কি, তোদের দেশ কোথায় ছিল রে?' কর্মরত লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করে কার্ত্তিক।

—'সে অনেকদূর গো—পাঁচ গাঁ। ডায়মন্‌হারবার লাইনে বাশুলডাঙ্গা ইষ্টিশান। সেথায় নেমেও এককোশ হাঁটাপথ।'

—'তোরা ক'বছর আছিস হেথায় ?'

—'তা' হ'বে ধর গিয়ে তিন বছর। তুমি ত' এলে এই সেদিন।' লক্ষ্মীর বাবা ক'লকাতায় কোন্ মিলে চাকরি ক'রত। ওরা থাকত দেশের বাড়ীতে। কত মজার দিন ছিল সব। তারপর ওর দাদা ম'রে গেল দেশের বাড়ীতেই 'মায়ের দয়া' হ'য়ে। ক'লকাতায় বাপের হ'ল অসুখ। গাঁয়ের বাড়ী বেচে দিয়ে ওরা চ'লে এল। ওর মা দুঃখধান্দা ক'রে পরের বাড়ী খেটে খায়। এ সব ত' আর শ্বশুরবাড়ীর গেরামে চলে না। এ সব কথা কার্ত্তিকের অনেকবার শোনা।

—'খাওয়া হ'য়েছে তোদের, নক্কি ?' খামকা শুধায় কার্ত্তিক।

—'কখন, সেই সনঝেবেলা। তোমার লেগে ব'সে আছি কিনা ?'

—'এ বেলা কি হ'ল তোদের, ভাত না রুটী ?'

—'ভাত, মুসুরির ডাল, চুণোমাছ ভাজা, মোচার ঘণ্ট, তেঁতুলের টক।' গম্ভীরমুখে বলে লক্ষ্মী।

—'ইস্, পেটের জন্যেই মরিস তোরা। খাওয়ার বেলা ত' সাত তরকারী। আর বাবার চিকিচ্ছে করাচ্ছিস নে ?' তিরস্কারের সুর কার্ত্তিকের গলায়।

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে লক্ষ্মী,—সাত তরকারী না ছাই। পান্তাভাত, তেলনুন, আর লঙ্কা-পেঁয়াজ। জান, কার্ত্তিক দা,' ও সব খেতে খুব সখ যায় কিনা তাই নাম ক'রলাম।'

—'রুটী খাবি, নক্কি, একখানা ?'

—'থাক্, অত দরদ। আপনি পায় না শুতে, আবার শঙ্করাকে ডাকে। সেই বিত্তান্ত।'

ও ঘর থেকে কাসির আওয়াজ আসে। বুকের পাঁজরগুলো যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। লক্ষ্মীর মুখটা ভয়ার্ত্ত হ'য়ে ওঠে,—বাবা বোধ হয় আর বাঁচবে না, কার্ত্তিক দা।'...

'ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ইলেক্‌ট্রিক বেলের শব্দে কার্ত্তিকের তন্ময়তা ভাঙ্গে। পাশের বাড়ীর বাবুর অর্ডার এলো। এ ডাকের মানে সে বোঝে,—'দোপেঁয়াজী, কাট্‌লেট্, দু'-পেগ্...' কার্ত্তিকের বুকটা ধড়াস্ ক'রে ওঠে কেউ শুনতে পায়নি ত' ?

পাশের বাড়ীর বাবুর অর্ডার পৌঁছে দিয়ে এসে কার্ত্তিক ভাবছিল। কাল রাত্রে দেখা বাবুটার মুখের সঙ্গে এ মুখের যেন অদ্ভুত মিল আছে। কাল রাত্রে যথারীতি ঘরে ফিরে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রল কে ?' ওদিকে লক্ষ্মীদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে র'য়েছেন এক ভদ্দরলোক। ওদের ঘরের কালিকুলি মাখা হ্যারিকেনের টিম্‌টিমে আলোয় সে মুখটা দেখল আবছা। কার্ত্তিকের গলার সাড়া পেয়ে দোর খুল্ল লক্ষ্মী।

—'নক্কি, তুই এ ঘরে? তোদের ঘরের দাওয়ায় ভদ্দরলোকটি কেরে?' সন্দেহ আর উদ্বেগ মেশান গলায় জিজ্ঞেস করে কার্ত্তিক।

—'জানি নে যাও। ভারী আমার ভদ্দরলোক। দরদ দেখাতে এয়েছেন। বিনে চিকিচ্ছেয় ম'রে যাক না আমার বাবা। তা' ওর কি?' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে লক্ষ্মী। কার্ত্তিক বুঝল না কিছুই। দাঁড়িয়ে রইল অবাক হ'য়ে।

—'আমি হ'য়েছি আমার বাপমায়ের শত্তুর, আর আমার এই শরীল্ হ'য়েছে আমার নিজের শত্তুর্।'

কার্ত্তিক চ'মকে ওঠে হঠাৎ। অপাঙ্গে তাকাল লক্ষ্মীর দিকে। এতদিনের দেখাশুনোর মধ্যে ঠিক এমনি ক'রে ত' তাকে কোনদিন দেখেনি সে। আজ সে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী। তার অত্যন্ত চেনা। যৌবনের সংকেত তার দেহের শিরায় উপশিরায়। গাল বেয়ে গড়িয়ে প'ড়ছে অশ্রু—বিন্দু বিন্দু মুক্তোর মতো। উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে স্পন্দিত তা'র বুক।

আরও রাত হ'ল। লক্ষ্মীকে এগিয়ে দিয়ে এল সে ওদের ঘরে। ঘরে ফিরে অন্ধকার শয্যায় শুয়ে রইল কার্ত্তিক। তার সুস্থ মামুলি চিন্তাধারায় একটা বিপ্লব বাধিয়ে দিয়ে গেল লক্ষ্মী। তাদের ছোট গৃহস্থালী। সে আর লক্ষ্মী। রেস্টুরেণ্টের চাকরি ছেড়ে দেবে সে। নিজের সামান্য পুঁজি নিয়ে ছোট একটা দোকান খুলবে চা জলপানের। ঘরে লক্ষ্মীর নিজের হাতে রান্না। দু'বেলা তৃপ্তিতে খাওয়া। ভাত, মুসুরির ডাল, চুণোমাছ ভাজা—লক্ষ্মী যা' যা' ব'লেছিল। ঝগড়াঝাঁটি নেই, অফুরন্ত শান্তি।

বস্তীর উত্তরদিকে হিন্দুস্থানী বাসিন্দাদের ঢোলকসহযোগে 'রামাহো' চীৎকার আজ কার্ত্তিকের ভাল লাগল। কাছাকাছি যে মোষের বাথানটা আছে, সেখান থেকে ওঠা গোবরপচা একটা ভ্যাপসা গন্ধে বস্তীর হাওয়াটা ভারী হ'য়ে থাকে সব সময়েই। সে গন্ধ আজ তার নাকে গেল না। তার ভাবীদিনের কল্পনারঙীন ছবি তন্দ্রালু চোখের পাতায় হলদে স্বপ্নের মত জড়িয়ে গেল।

'চ্যাঁ চ্যাঁ, চ্যাঁ'। পেঁচার কর্কশ চীৎকারে কার্ত্তিকের চিন্তা টুটে গেল। লাল-বাড়ীটার অন্ধকার ছাদের আলসেয় ঝুঁকে প'ড়ে কে যেন টর্চ্চের আলো ফেলেছে। একি! পেঁচাটা ম'রে গেছে! চমকে উঠল কার্ত্তিক। মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে আর্ত-চীৎকার ক'রছে ওর সঙ্গীটি। টর্চ্চটা একটু নড়ে উঠে নিবে গেল। আর তারই এক টুক্‌রো আলোয় কার্ত্তিক দেখল—উকিলবাবুর মেয়ে, হাতে সেই বন্দুক। হঠাৎ এক ঝলক আলো ফেলে কে যেন তার মনের অন্ধকারকে ছিন্ন ক'রে দিল। সেই আলোতে সে স্পষ্ট চিনল আগের রাত্রির আবছা আলোয় দেখা আগন্তুকের অচেনা মুখ।.....

—'দু'কাপ চা, দু'টো কেক্।' হাঁক দেয় গণশা। কার্ত্তিক যন্ত্রচালিতের মত কেট্‌লীটা হাতে তুলে নেয়।

যে জন আছে মাঝখানে

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য

আমরা বাঙালী মধ্যবিত্ত, বিত্ত-ব্যাপারে মধ্য বলেই আমাদের এই নামকরণ। সেদিক্ থেকে আমরা একটা আলাদা জাত, কাঞ্চনকৌলীন্য না থাকায় আমরা কুলীন নই। বনেদী নই, কেন না আমাদের বংশ বেশী দিনের নয়, তবে ইতিমধ্যে রক্তবীজের বংশের মত আমরা বেড়েই চলেছি, দেড়শো বছরে অন্য কিছুর এত বাড় হয়েছে বলে জানিনে। লোকে বলে: অতি বাড় বেড়োনা ঝড়ে ভেঙে যাবে,—অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝা যে মায় আমাদের ভিত আজ টলিয়ে দিচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কি ?

আঠারো শতকের গোড়া থেকেই ভাগীরথী বাঁধা পড়েছেন বিদেশী বেনিয়ার রূপোর শিকলে। তাই পলাশীর পরাজয় ছল মাত্র। ইংরেজ জিতল ছলে-বলে-কৌশলে। তারপর সুরু রদবদল ঘটার পালার। পুরোনো দল গিয়ে ভুঁইফোঁড় নতুন দলের মাথা তোলা। নতুন জমিদার-জোতদার, নতুন রাজার তৈরী নতুন বন্দোবস্ত, নতুন খাজনা, কাশিমবাজারী, শোভাবাজারী গদি তার নমুনা। এমনি কোরেই ঘটল নয়া বাংলার গোড়াপত্তন।

এদিকে শহর দেখা দিল, গ্রাম গিয়ে নগর এল। তাঁতির তাঁত গিয়ে ভাত উঠল। সাদা বর্গীর শোষণ, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে বললে শোনে না। দেশী সাধুর সপ্তডিঙা মধুকর আর ভাসে না—এবার গর্জে ওঠে বিদেশী সদাগরের পোত। আমরা সেদিনের অনাবাদী জমিতে রাতারাতি গজিয়ে উঠলাম—কেউ হলাম বেনিয়ান, কেউ হৌসদার, কেউ বা মুৎসুদ্দি। এই আমাদের আদিপর্বের সূচনা। তখন আমরা আচকান-পাগড়ি পরি, সাহেব-পদে গড়াগড়ি খাই, কবি, আখড়াই খেউড়কে বাহবা দিই, বণিক্ প্রভুর মনোরঞ্জনে বাইনাচের ফরমাশ করি। এ সবকথা কালীপ্রসন্ন সিংহ বেশ রসিয়ে লিখেছেন 'হুতোম পেচার নকশা'য়, তখন আমাদের নাম ছিল 'বাবু'। 'সমাচার দর্পণে' যে 'বাবু উপাখ্যান' বেরিয়েছিল সে হুবহু আমাদের মুখচ্ছবি। তারপর 'নব-বাবু-বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ আমাদের সেদিনের চেহারাটা খুব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 'হুতোম' আর শিবনাথ শাস্ত্রী মিলে আমাদেয় মুখ দেখাবার জায়গা আর রাখেননি। তাতেও ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু মিসেস বেলেন্‌স রেখে গেছেন তুলির আঁকা ছবি।

অথ সভ্যপর্ব। এই পর্বে আমাদের নাম ইয়ং বেংগল, মুখ্যনিবাস কলকাতা। আমরা ডিরোজিওর অন্ধ চেলা, বিশপস্ কলেজে পড়ি, 'ড্রিংক্' করি, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ শেষে গোঁড়া বামুন পণ্ডিতের বাড়ি হাড় কখানা ছুঁড়ে দিয়ে মজা দেখি, ইংরেজিতে কথা

বলি, 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভার সভ্য হই। কিন্তু আমরাই সতীদাহ বন্ধ করি, বাল্য-বিবাহ-চেষ্টা রুখে দাঁড়াই, বিধবার বিয়ে দিই, পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা চালাই। আমরা গৌরীশংকরের চূড়ো মাপি, দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি, বাংলাসাহিত্যের মরা গাঙে বান ডাকাই। আমরাই বাংলার রেনেসাঁ।

এরপর বন-বিরাট্-উদ্যোগপর্ব। কল-কারখানা-মিল-ফ্যাক্টরি-আপিস-আদালত, শহর-শহরতলী, জলের কল, পিচের-রাস্তা, বায়স্কোপ। আমরাও ক্রমশঃ বেড়েছি তাল রেখে রেখে। তারপর প্রথম কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ দেখলাম প্রায় চেয়ে চেয়েই। আমরা অনেকটা নির্বিকারই ছিলাম সেদিন। কিন্তু জীবন যুদ্ধ এমন আকার ধারণ করল যে অস্তিত্ব বজায় রাখাই দুরূহ হল। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষায় ধিক্কার দিলাম, সরকারী-সদাগরী আফিসে ঘুরে ঘুরে জুতো ছিঁড়লাম, পটলডাঙার মেসে শুয়ে 'কালি কলমে' বিদ্রোহের 'কল্লোল' ধ্বনিত করলাম। সদাগরী আপিসের কনিষ্ঠ কেরাণী হরিপদ আমাদেরই সেদিনের সগোত্র। মধ্যবিত্তেরা তার আগে থেকেই অবশ্য দুতরফে ভাগ হয়ে গিয়েছিল—উচ্চ আর নিম্ন। নিম্নই সংখ্যাগুরু। হরিপদ কেরাণী এই সংখ্যাগুরু দলের সদস্য। 'ধলেশ্বরী নদীতীরে' পিসির দেওরের মেয়ের কথা আমরাও সেদিন ভেবেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি এই ভেবে, 'মেয়েটা তো রক্ষা পেলে আমি তথৈবচ'। আমরা সেদিনের হতাশ অক্ষৌহিণী। এলিয়ট আমাদেয় প্রাণের কথা বলেছিলেন সুন্দর ক'রে ঃ

We are the hollow men,
We are the stuffed men,
Leaving together
Head piece filled with straw, Alas!

আজ আমাদের ছেলেরা নোট মুখস্থ করে, পরীক্ষার হল-এ বইএর পাতা ছেঁড়ে, ধরা পড়লে গার্ডের মাথা ফাটায়, দৈবক্রমে রক্ষা পেলে স্বচাতুর্যের আত্মপ্রসাদে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত করে। ডিগ্রী পেলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, ধূম-উদ্‌গীরণ করতে করতে সিনেমার লাইনে দাঁড়ায়। ফেল হলে আফিং খেয়ে পাড়া জমায়, নতুবা বাক্‌স ভেঙে বিবাগী হয়। আমরা পিতামাতারা অঝোর অশ্রুবর্ষণ করতে করতে সংবাদপত্রের নিরুদ্দেশ স্তম্ভে আবেদন ছাপাই ঃ 'বাবা ফিরে এস'।

আমাদের ছেলেরা চাকরি পেলে সিংহের পঞ্চপদ দর্শন করে, বেকার বন্ধুদের ব্যবসা করবার উপদেশ দেয়, মায়ের কাছে সাহেবের পিঠ চাপড়ানির গল্প সতর্জনে শোনায়, না পেলে, পিতৃদেবকে দোষারোপ করে ঃ "Bad luck! বাবা আমার জন্যে অমুক এম. এল. এ. কে একটু ধরলে না!"

আবার আমাদের ছেলেরাই দেশ-বিদেশের জ্ঞান লুঠে আনে, সংসারের আয়ের

জন্য উদয়াস্ত শ্রম-বিনিময় করে টি.বি.-তে মরে। আমাদের ছেলেরাই ফাঁসি যায়। কালাপানি পার হয়, গুলি খায়, স্বাধীনতার ভিত রচনা করে।

আমাদেয় মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত রকমের সমাজচেতন। তারা জানে রূপা না হলে রূপ খোলে না, স্বর্ণমানই দুনিয়ার প্রকৃত-মান। তাই তারা নামে সুহাসিনী হলেও প্রকৃতপক্ষে অশ্রুমতীরূপেই বিরাজ করে। তারা জোরে কথা বলে না, জোরে পা ফেলে না, কেন না কারও পরে তাদের জোর নেই। বিয়ে তাদের কাছে সুখের চেয়েও বেশী সোয়াস্তির। তাই কখনও কখনও বিষ খায়, গলায় দড়ি দেয়, কেরোসিন কাপড়ে ঢেলে মা-বাপকে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দেবার পথ খোঁজে।

কিন্তু তবুও চিন্তা থেকে যায়। কারণ আমাদের মেয়েরাই হাস্যকরভাবে বড়লোকের মেয়ের অনুকরণ করবার ব্যর্থ প্রয়াস পায়, নকল মুক্তোকে সাচ্চা বলে চালাবার চেষ্টা করে, ফ্যাসানের মোহে ব্যসনের মাত্রা ছাড়ায়। তারা ফিল্মের নায়িকার সহোদরা বেশে-বাসে-সজ্জায়, বিকৃত রোমান্তিক স্বপ্ন তাদের মজ্জায়, আধুনিকতার উগ্র বিজ্ঞাপন নির্লজ্জায়।

আবার আমাদের মেয়েরাই লাটকে গুলি করে, গুলিও খায়, দলে দলে জেলে যায়। ধোঁয়াভরা অন্ধকার ঘরে তিলে তিলে শুকিয়ে মরে বিনা প্রতিবাদে। দেহের শেষ আভরণ পরার্থে খুলে দেয় অম্লানবদনে। সর্বংসহা ধরিত্রীর মত রোগ-শোক-দুঃখ-লাঞ্ছনার জগতে স্বামী-পুত্রের জীবনকে সুস্থ রাখতে হাসিমুখে আত্মবিসর্জন করে। আমাদের মেয়েরাই আজ আপিস-হাসপাতাল-স্কুলে কাজ করে পিতা-ভ্রাতা, স্বামী-পুত্রের জান-মান বাঁচায়।

দুনিয়ার হালচাল দেখে মনে মনে বুঝেছি আজ আমাদের মহাপ্রস্থান-পর্ব শুরু হয়েছে। আগমন প্রস্থান সৃষ্টি-নাটকের মূল নীতি। সুতরাং তার জন্যে ক্ষোভ করা বোকামি। কিন্তু প্রস্থানটার রূপ কি হবে সেইটেই চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। কেননা আজ আমরা ত্রিশঙ্কু। না স্বর্গে, না মর্তে, না এদলে, না ওদলে। অথচ দু'দিকেই পা বাড়াবার চেষ্টা আছে। 'গান্ধারীর আবেদনে' ধৃতরাষ্ট্র বলেছে: 'এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরীপরে, পা দিয়ে বাঁচে না কেহ'—কিন্তু আমরা ঐ রীতিতেই বেঁচে থাকতে চাই। তাই গান্ধী ও গোড়সে উভয়ের ছবিই ঘরে টাঙাই।

আমরা ধনিকের বিরোধী, ধনতন্ত্রের নই। ধনী হবার বাসনার ব্যর্থতায় 'উদয়ের পথে' লিখে গায়ের ঝাল মেটাই, ধনী কন্যাকে শ্রমিকদরদী সাজিয়ে প্রগতিশীল হই। আমরা বড় হতে চাই, কিন্তু সবাই বড় হয় এটা চাইনে। কেননা তাহলে আমার মোটর ভ্রমণের দর্শক থাকবে না। গাড়ী-বাড়ী, ঘোরানো সিঁড়ি, ছোটো লন-এর স্বপ্ন লটারীর টিকিটকে কেন্দ্র করে বহু শান্ত রাতকে বিনিদ্র করে। ঘোড়দৌড় উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বহুবার ঘুরপাক খায়।

আমরা কখনও কখনও সমাজতন্ত্রের কথা বলি। রক্তাক্ত বিপ্লবের জয়গান গাই,

মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলে সর্বহারার একনায়কত্ব রচনা করি। কিন্তু বচনে বামপন্থী হলেও করণে বামাপন্থী হওয়াটাই আমাদের স্বধর্ম। আমরা ধর্মঘট ডাকি, শ্রমিক ক্ষেপাই, কমরেড বলে মজদুরকে বুকে ধরি, আড়ালে মালিকের ঘুষ খাই, দালাল সাজি, ধর্মঘট ভাঙি।

আমরা ঘরে-বাইরে বিপরীত। ঘরে মনিব, বাইরে চাকর। ঘরে চা পেতে দু-মিনিট দেরি হলে শ্বশুরকুলের আদ্যশ্রাদ্ধ সারি; আপিসে সাহেব লাথি মারলে কোটের ধুলো ঝেড়ে দন্ত বিকশিত করে হাত কচলাই। বাইরে নারীপ্রগতির বক্তৃতা করি, মেয়ে দৈবাৎ ছাদে উঠলে মারধোর করতে কসুর করিনে। বাইরের রেস্তোরায় বাবুর্চির হাতের নিষিদ্ধ মাংস পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করি, ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শনি-সত্য-নারায়ণের পাঁচালী পড়ি। আমাদের যা আছে তাকে ঢাকি, যা নেই তারই ঢাক পেটাই।

আমরা সর্বজ্ঞ হয়েও দৈবজ্ঞে বিশ্বাস করি সবচেয়ে বেশি। পার্কের পাশে প্যান্ট-কোট পরে নিরক্ষর জ্যোতিষীর সামনে হাত মেলে ধরি, যদি ধন-দৌলত কিছু মেলে। আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্যে বিশ্বাসী বলে গর্ব করি, কিন্তু মঘা-অশ্লেষা ত্র্যহস্পর্শে বাড়ির বার হইনে, দিক্‌শূল মানি, অনুকূল-প্রতিকূল স্বামীর ঝোলা বহে বেড়াই, কবচে-তাবিজে হাত ভরাই, কালীঘাট-তারকেশ্বরে ধরণা দিই, গ্রহশান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করাই।

আমরা এই ধরনের বিচিত্র জীব। আমরা মধ্যবিত্ত থেকে আজ নির্বিত্ত স্তরে উপনীত। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আমাদের জন্ম হয়েছিল, তখন আমাদের দেহে রক্ত, মনে বল, প্রাণে সাহস ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের রক্তক্ষয়ে আজ দেহে বিপরীত ক্রিয়া সুরু হয়েছে। আজ আত্মপ্রতারণাকে আমরা তারণমন্ত্র ধরে নিয়েছি, ভুলেছি যে ঐ আমাদের মারণ-অস্ত্র। তাই অপভাষণ আমাদের উপভাষা, দম্ভ আমাদের আভিজাত্য।

গত দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র আমাদের সমাজে এক ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক-গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। এদের মিল আমাদের আদিপর্বের 'বাবু'র দলের সঙ্গে। চোরাবাজার এদের রাজত্ব, কিন্তু হাল-বাংলায় সংস্কৃতি এদেরই দাসত্ব করছে। এদের রুজি আছে, রুচি নেই, তবু এরাই আজ জনগণমন-অধিনায়ক।

ঠাট বজায় রাখাই আমাদের আদি ও শেষ সমস্যা। যে পথে চলেছি সেখানে এর সমাধান হয় না, হবেও না। আজ আমরা বড় ক্লান্ত, বড় রুগ্ন। কিন্তু এ ভাবেই কি পচে গলে শেষ হব? কি হবে গলিত, পঙ্গু, মৃত্যুহীন-শবের জীবন যাপন করে? আজ—"আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু, আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া"। তাই মহাপ্রস্থান-পর্বের শেষপাদে দাঁড়িয়ে বলতে ইচ্ছা হয়—এভাবে নয়, বরং—"মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে বজ্রের আলোতে"।

ট্র্যাজেডী

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায়

(ষষ্ঠ বর্ষ—বিজ্ঞান)

ট্র্যাজেডীর সংজ্ঞা Aristotle দিয়েছিলেন :—"Tragedy is a representation of an action, which is serious.....it is acted, not merely recited ; and by exciting pity and fear it gives a healthy outlet to such emotions." ট্র্যাজেডীর মধ্যে দুঃখজনক পরিসমাপ্তি থাকবে এ কথা সংজ্ঞাটির মধ্যে নেই। "Rrepresentation of an action which is serious"— অর্থাৎ ট্র্যাজেডী মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির নাটকীয় রসরূপ—সংজ্ঞার এই অংশটুকু নিয়ে পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট বাগবিতণ্ডা হ'য়েছে। ট্র্যাজেডী মানবজীবনের ঘটনাবলীর হুবহু অনুকরণ —এ কথাই কি Aristotle বলেছেন? বহু সমালোচনা ক'রে তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত বুঝতে পেরেছেন যে Aristotle ট্র্যাজেডীর মধ্যে মানবজীবনের অন্তর্নিহিত অনুভূতি ও আবেগগুলিকে ফুটিয়ে তোলার কথাই বলতে চেয়েছেন, জীবনের বাইরের রূপটির অনুকরণের কথা বলেন নি।

Aristotle-এর সংজ্ঞা আধুনিক সমালোচকেরা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। কারণ নাটকের পরিসমাপ্তি কি রকম হ'বে সে' সম্বন্ধে Aristotle কিছু না ব'ললেও জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলি নাটকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই যে ট্র্যাজেডীর কাজ এ' বিষয়ে তাঁদের মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু ট্র্যাজেডীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে Aristotle যা ব'লেছেন —"by exciting pity and fear it gives a healthy outlet to such emotions"— তা' মেনে নেওয়া সহজ হয় নি। কারণ, অহরহ মানুষের মন দুঃখে বা বেদনায় উত্তেজিত বা আবেগসংক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকে না এবং যারা ট্র্যাজেডী পাঠ করে বা ট্র্যাজেডীর অভিনয় দেখে তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য হয় সময় কাটানো নতুবা আনন্দ উপভোগ। মন দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হওয়ার দরুণ সেই ভার লাঘবের জন্য থিয়েটারে গিয়ে ট্র্যাজেডীর অভিনয় দেখার ইচ্ছা কদাচিৎ দেখা যায়। তা ছাড়া অধিকাংশ মানুষের জীবনই একঘেয়ে জীবিকান্বেষণ—সেখানে আর্থিক কষ্ট, প্রিয়জনের মৃত্যু, মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাওয়া, ছেলের প্রবাস যাত্রা ইত্যাদি ছোটখাটো দুঃখ ছাড়া বড়ো রকম দুঃখ বা হৃদয়াবেগের কারণ কমই দেখা দেয়। আমরা থিয়েটারে—বায়োস্কোপে যাই যে যে উত্তেজনা বা আনন্দ আমাদের জীবনে নেই তারই অন্বেষণে।

জীবনের সমস্যা ট্র্যাজেডীর বিষয়বস্তু—যেহেতু সমস্যার মধ্যে দুঃখ ছাড়া আনন্দ নেই, ট্র্যাজেডীকে ক্রমশঃ জীবনের দুঃখেরই নাট্যরূপ হিসাবে ধ'রে নেওয়া হ'ল। মধ্যযুগীয় সমালোচকেরা বললেন মানুষ দুঃখবিলাসী—ট্র্যাজেডীর মধ্য দিয়ে দুঃখভোগের চরম আনন্দ পাওয়া যায়। Hume বললেন যে একঘেয়ে নীরস জীবন যাপনের চেয়ে দুঃখভোগও শ্রেয়। Fontelle বললেন যে চরম আনন্দ এবং চরম বেদনার মধ্যে তফাৎটা মাত্রাগত—উভয়ই আমাদের কাছে সমান উপভোগ্য। তিনি বললেন, ট্র্যাজেডী যত বেশী ভয়াবহ হবে, তত বেশী আনন্দ দেবে, কারণ দর্শকরা তার অবাস্তবতা এবং কাল্পনিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। Hume ট্র্যাজেডীর নায়কের প্রসঙ্গে এই কথা ব'লেছেন যে নায়ক যদি দর্শকদের মনে সমবেদনার সঞ্চার করে আনন্দের অর্ধেক যাবে মাটি হ'য়ে—কারণ দর্শক তাকে দুঃখের মধ্যে হাবুডুবু খেতে দেখ্‌তে ভালোবাসে—সে পাকা নায়কের মতো দর্শকদের দয়া বা সমবেদনার বহু উর্দ্ধে দুঃখের অনলে জাজ্বল্যমান হ'য়ে বিরাজ করবে, দর্শকেরা স্তম্ভিত হ'য়ে তার দিকে চেয়ে থাক্‌বে রুদ্ধশ্বাসে, তবেই ট্র্যাজেডীর উদ্দেশ্য হ'বে সার্থক।

উক্ত দার্শনিকদের উক্তি থেকে মনে হয় যে নিছক দুঃখ উপভোগের সখ মেটানোই বুঝি ট্র্যাজেডীর উদ্দেশ্য। তাঁদের উক্তির যথার্থতা বুঝতে পারি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যত ট্র্যাজেডী রচিত হ'য়েছে—তাদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে। তারা যে সব দুঃখ এবং সমস্যার সৃষ্টি ক'রেছে তাদের মধ্যে মানুষকে কোন বাস্তব পটভূমিকা বা কোন সমাজের মধ্যে দেখি না—মানুষের উত্থান-পতনের কারণ খুঁজতে গিয়ে কেবলমাত্র দৈবেরই সাক্ষাৎ মেলে। কেবলমাত্র মানুষের উপভোগের উপজীব্য হিসাবে ট্র্যাজেডী রচনা চলেছিল মধ্যযুগ থেকে সুরু ক'রে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডীগুলি প'ড়ে মনে হয় যে নাট্যকার দর্শকদের মনে প্রচণ্ড আবেগ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি এমন সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করে-ছিলেন, যারা সকলেই অসামান্য—তাদের উত্থান ও পতন, অনুরাগ ও বিরাগ, জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ও প্রচণ্ডতর বিতৃষ্ণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের টেনে আনলেন অনর্থের মধ্যে—শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর কবলে। সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডীর মধ্যে যে সব সংঘাত আছে তা' ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং নিয়তির সঙ্গে ব্যক্তির—কুত্রাপি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির নয়। সেক্সপীয়ার যে সব সমস্যার সৃষ্টি ক'রেছেন তাঁর ট্র্যাজেডীগুলিতে সেগুলি ব্যক্তিগত কামনা, উচ্চাভিলাষ বা অনুরাগসঞ্জাত—সেই সব সমস্যার মধ্যে কোন একটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠী বা সমাজের ছবি ফুটে ওঠে না।

'বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডী' প্রবন্ধে মোহিতলাল মজুমদার উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডীর উদাহরণ স্বরূপ Victor Hugo-র "Toilers of the Sea" উপন্যাসের কথা উল্লেখ

ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন, 'Toilers of the Sea' প্রেম বা যৌনপিপাসার একখানি চূড়ান্ত ট্র্যাজেডী। উপন্যাস আকারে এই যে ট্র্যাজেডী ইহাতে কবি প্রেমের পৌরুষ ও প্রেমের আত্মত্যাগ, দুয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির মধ্যে নাটকের দ্বারা যে চমকপ্রদ অসাধ্য সাধিত হ'য়েছে তা' আমাদের স্তম্ভিত করে সত্য—কিন্তু পৌরুষকে প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হ'য়েছে তা'ও স্বীকার করতে হয়। 'Toilers of the Sea' দৈবের সঙ্গে একটি ব্যক্তি জীবনের সংঘাতের ট্র্যাজেডী—তার প্রেমের জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস এবং নিদারুণ আত্মবিসর্জন দৈবের নিষ্ঠুরতার আভাস দেয়। Gilliat-এর চরিত্র Victor Hugo বিশেষ ক'রে ট্র্যাজেডীর জন্য কেবলমাত্র তাঁর কল্পনার সাহায্যে গ'ড়ে তুলেছেন।

মানবজীবনের ও সমাজের সমস্যা নিয়ে ট্র্যাজেডী রচনা শুরু হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইব্‌সেন কর্ত্তৃক। ইব্‌সেনের রচনাগুলি থেকে আমরা ট্র্যাজেডীকে নতুন ক'রে বুঝতে শিখলাম। পুরাতন সমাজব্যবস্থার অচলায়তনের মধ্যে নিপীড়িত মানবাত্মার এমন নিদারুণ নাট্যরূপ ইব্‌সেন দিয়েছেন যে স্তম্ভিত হ'তে হয়। ইব্‌সেনের নাটকের ট্র্যাজেডী মোহভঙ্গের ট্র্যাজেডী—সমাজের রচিত ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে প্রাণপণ মানিয়ে নেওয়ার ট্র্যাজেডী—পুরাতন বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়ার পর নতুন কোন অবলম্বন এবং আশ্রয় না পেয়ে দিশাহারা হ'য়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডী। ইব্‌সেনের নাটকগুলি প'ড়ে আমরা যেমন স্তম্ভিত হই, তেমনি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের বন্ধন কত দুর্ব্বল—সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাকে কত অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে, কত মোহের সৃষ্টি করতে হয়। ইব্‌সেনের নাটক পড়ে কখনোই মনে হয় না যে দুঃখ বস্তুটি খুবই উপভোগ্য বা দুঃখকে উপভোগ্য ক'রে তুলবার জন্য ইব্‌সেন নাটক লিখছেন। ইব্‌সেনের নাটক পড়ে যে আনন্দ পাই সে আনন্দ অপ্রিয় সত্য-উপলব্ধির আনন্দ। ইব্‌সেনের নাটক মনের মধ্যে একটা সাময়িক আবেগ বা উত্তেজনার সঞ্চার ক'রেই ক্ষান্ত হয় না—দীর্ঘস্থায়ী গভীর চিন্তার খোরাক দেয়—মনকে ক'রে তোলে তার পরিবেশ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন।

এখানে দুইটি মাত্র উদাহরণ দেব—"A Dolls' House" এবং "Ghosts." "A Dolls' House" -এর মধ্যে দেখানো হয়েছে যে দাম্পত্য বন্ধন কত ক্ষীণ—কত সহজেই তা' ভেঙ্গে পড়তে পারে। Torvald Nora-র সঙ্গে খেলার পুতুলের মতো ব্যবহার ক'রে এসেছিল আজীবন—তাকে তার নিজের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ক'রে নিতে পারেনি। Noraও নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছে স্বামীর খেলার সাথী হিসাবে, তার মনে কোন অভিযোগের উদয় হয় নি—কারণ স্বামী যে তাকে খেলার পুতুলের অতিরিক্ত মর্য্যাদা দেয় না সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল না। কিন্তু একদিন তার মোহ

ভাঙ্গল যখন সে জানতে পারল Torvald-এর কাছে তার ব্যক্তিগত মান-মর্য্যাদা, যশ-প্রতিপত্তি এবং সুনামের তুলনায় তার মূল্য সামান্যই—ঐগুলির জন্য সহজেই Torvald তাকে ত্যাগ করতে পারে। এই চরম উপলব্ধি Noraকে বুঝিয়ে দিল যে যে সুখী দাম্পত্য জীবন তারা যাপন ক'রছে—তা' কত বড়ো মিথ্যা। তার মনের মধ্যে নিদারুণ আত্মগ্লানির উদয় হ'ল। সুদীর্ঘ মূল্যবান আটটি বৎসর সে এমনি মোহের মধ্যে ডুবে থেকে নিজের দেহ-মন সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ ক'রেছে যার কাছে সে তাকে বুঝতে চেষ্টা করে নি এবং সে তার কাছেও আগন্তুকের মতোই চির-অপরিচিত রয়ে গেল। তার মনে হ'ল এই আটটি বৎসর Torvald-কে সুখী করবার জন্য সে যা ক'রেছে তা হ'চ্ছে রূপোপজীবিনীরই কাজ।

Nora-র এই চরম উপলব্ধি যে contrast-এর মধ্য দিয়ে নিদারুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে তা' বিস্ময়কর।

যে বিবাহ প্রথাটাকে সমাজ পবিত্র মনে করে সময়বিশেষে তার অত্যাচার একটি স্ত্রীলোকের জীবনকে কি ভাবে বিনষ্ট ক'রে দেয় "Ghosts' নাটকের মধ্যে—তা' পরিস্ফুট হ'য়েছে। Mrs. Alving দুশ্চরিত্র স্বামীর সংসর্গ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে স্বামীর বন্ধু ধর্মযাজক Manders-এর কাছে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে। তাঁর বিবাহের এক বৎসর পরেই ঘটে এই ঘটনা। কিন্তু Manders তাঁকে বিবাহ প্রথার পবিত্রতা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য ইত্যাদির দোহাই দিয়ে তাঁকে বাধ্য করলেন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে। তার পর থেকে Mrs. Alving-এর প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হ'তে লাগল। তাঁর একটি ছেলে হ'ল। সেই ছেলে একটু বড়ো হ'তেই তাকে তিনি তাঁর স্বামীর সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন এই আশায় যে ছেলেকে নিয়ে Alving এর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনের গ্লানিকে ভুলতে পারবেন। Alving এর মৃত্যুর পর পুত্র Oswald যাতে তাঁর সম্পত্তির এক কণাও না পায় সেজন্য তিনি Alving এর সমুদয় সঞ্চিত অর্থ দিয়ে গ'ড়ে তুললেন Aving Orphanage. Oswald কে Alving-এর স্পর্শ থেকে তিনি বাঁচিয়ে রাখলেন ঠিকই, কিন্তু Oswald-এর কাছে তার পিতার সত্য পরিচয় দিতে সাহসী হ'লেন না—তাঁর কাছ থেকে পত্র মারফত Oswald জানল তার পিতার মত চরিত্রবান মহৎ লোক আর হয় না। কাজেই Alving তাঁর যথেচ্ছাচারের ফলে যে রোগে ভুগ্‌তেন সেই রোগ জন্মসূত্রে লাভ ক'রে সে দিশাহারা হ'য়ে পড়ল। সে যথেচ্ছাচারী ছিল না—কি ক'রে এই রোগ তার দেহে প্রবেশ ক'রেছে—ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনের স্থৈর্য্য গেল বিনষ্ট হ'য়ে। Mrs. Alving পুত্রকে কেন্দ্র ক'রে যে সুখ-স্বপ্নের জাল বুনছিলেন সব গেল ভেঙ্গে। পুত্রের মনের গ্লানি দূর করবার জন্য তার কাছে তার পিতার সত্য

পরিচয় দিলেন। কিন্তু যে রোগে সে আক্রান্ত তার উপশম হওয়ার সম্ভাবনা আর ছিল না। তার নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য Mrs. Alving কে সে অনুরোধ করল রোগ যন্ত্রনা যখন সাধ্যের অতীত হ'বে, যখন তার একেবারে অচল এবং চেতনাহীন হওয়ার সম্ভাবনা তখন তিনি যেন তাকে মর্ফিয়া খাইয়ে হত্যা করেন। Mrs. Alving চমকে উঠে বললেন, আমি তোমার মা—তোমাকে জীবন দিয়েছি—তোমাকে মর্ফিয়া দেব আমি! Oswald বলল, 'I never asked you for life.. And What kind of a life was it that you gave me? I don't want it! You shall take it back! '

এখানেই নাটকের climax. ছেলে মাকে তিরস্কার করছে, 'দুঃখের মধ্যে জন্ম দিয়ে—তারপর আমার সেবা করতে চাও? জন্ম দেওয়ার সময় মনে ছিল না মা হিসেবে তোমার দায়িত্ব? গরু মেরে জুতো দান করতে চাও?' এই প্রশ্ন "Ghosts" নাটকের স্তম্ভিত পাঠক এবং দর্শকদের মনের মধ্যে তপ্ত শলাকার মত এসে বিদ্ধ হয়।

"Ghosts" নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এই যে বহুপূর্ব্বে যারা মরে গেছে—সেই মৃত মানুষদের প্রবর্ত্তিত সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কারগুলি ভূতের মতো আমাদের চেপে ধ'রে র'য়েছে। তাদের চাপে আমরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের শক্তি হারিয়েছি। অশেষ দুঃখ ভোগ করে'ও তাদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে নিতে অক্ষম আমরা।

আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে আর একটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডীর কথা এখানে উল্লেখ কর্‌ব—Johan Bojer-এর "The Great Hunger." উপন্যাসটির মধ্যে আছে বুর্জোয়া অর্থসর্ব্বস্ব সমাজব্যবস্থা কি ভাবে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে তার উৎকর্ষের চরম শিখর থেকে একেবারে মাটিতে নামিয়ে আন্‌ল তার মর্মবিদারক কাহিনী। সে ছিল এঞ্জিনিয়ার। অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে সমাজের নিম্নতর স্তর থেকে সে সমাজের প্রবল বিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে ক্রমশঃ উঠ্‌তে উঠ্‌তে কালক্রমে দেশের শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনিয়ার হ'তে পেরেছিল। বুর্জোয়া সমাজ সুরু কর্‌ল তাকে exploit করতে—তার কাছ থেকে material gains কতটা হ'চ্ছে তাই বিচার ক'রে তাকে মূল্য দিতে লাগল, তার প্রতিভার বিচার ক'রে নয়। কাজেই সামান্য একটু breach of contract-এর দরুণ বুর্জোয়া সমাজ তার প্রতিভার প্রতি দৃকপাত মাত্র না ক'রে তাকে ঠেলে দিল পতনের মুখে। সেই পতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কি নিদারুণ প্রয়াস তার! কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ কিছুতেই তাকে দিল না দাঁড়িয়ে থাক্‌তে—তার প্রাণপণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাকে আবার মাটিতে নেমে আস্‌তে হ'ল—বাধ্য হ'তে হ'ল উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করতে।

Johan Bojer এই উত্থান পতনের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন অপরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে—জীবনের সমস্ত শক্তিক্ষয় ক'রে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রামে ক্লান্ত নায়কের মনে পরিশেষে এই প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন যে যে ভগবানকে জানে না তার জন্যে তো কত মন্দির মানুষ রচনা করল—কিন্তু এই যে মানবাত্মা অনাদিকাল থেকে সুরু ক'রে বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে তার অভিযান চালিয়ে এসেছে তার সম্মানে তো কোন মন্দির নির্মান করা হ'ল না। 'A temple for the modern spirit of man, hungry for eternity—not for babbling of prayers but for a hymn from man's munificent heart sent pealing, up to heaven. Will it come—will it one day be built?

Ibsen প্রবর্ত্তিত সামাজিক সমস্যামূলক নাট্য সাহিত্যের ধারা বার্ণার্ড শ'-এর নাটকগুলির মধ্য দিয়ে একটি নূতন খাত খনন ক'রে প্রবাহিত হ'তে থাকল। কিন্তু বার্ণার্ড শ'-এর লেখনীর সংস্পর্শে এসে তা' যে রূপ পেল সে এক অভিনব বস্তু—তাকে না বলা চলে ট্যাজেডী, না কমেডী। ইব্‌সেনের নাটকগুলির সমালোচনা প্রসঙ্গে "The Quintessence of Ibsenism" পুস্তকে বার্ণার্ড শ' Ibsen-এর নাটকগুলিকে ট্র্যাজেডী হিসেবে বিচার করেন নি। Ibsen-এর নাটকগুলি পুরাতন সমাজের অচলায়তন ভাঙ্গতে কি পরিমাণ আঘাত হেনেছে তা'ই তিনি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন।

সমালোচনা প্রসঙ্গে . তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য: 'Power of laughter is astonishing. It is not enough to say merely that men enable themselves to endure the unbearablest nuisances and the deadliest scourges by setting up a merry convention that they are amusing. তাঁর উক্ত এই কৌশলটি তিনি প্রয়োগ ক'রছেন তাঁর নাটকগুলির মধ্যে। তাই তাঁর গভীর সমস্যামূলক নাটকগুলি হ'য়েছে শ্লেষাত্মক এবং নাটকের কথোপকথনের মধ্যে গভীরতার তুলনায় যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য বজায় থাকে নি।

আধুনিক সাহিত্যিক বা নাট্যকারেরা বার্ণার্ড শ'-এর মতো নাটক ট্র্যাজেডী হ'ল না কমেডী হ'ল নিয়ে মাথা ঘামান না—তার কারণ কমেডী জিনিসটা ক্রমশঃ serious literature-এর সীমানা থেকে বহিস্কৃত হ'তে ব'সেছে। পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যে মানুষ ভাঙ্গনের যে ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ ক'রেছে—তার পর তার পক্ষে প্রচলিত সামাজিক কাঠামোটাকে আর অধিককাল সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই সে লিখ্‌ছে ভাঙ্গনের কাহিনী, সংস্কারের মোহমুক্তির কাহিনী—মিলনাত্মক উপন্যাস বা নাটক এখন সে আর লিখ্‌তে পারছে না।

শিকার

হরপ্রসাদ মিত্র

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে
শিকারের অজস্র উল্লাস।
ফুলে-ফুলে, গানে-গানে,
কটু-মধু বিচিত্র ভক্ষণে,—
বন্ধনে-নিধনে-যুদ্ধে
আহরণে-অর্জনে নিয়ত
কী বিচিত্র জীবনের
অন্তহীন, উন্মত্ত শিকার!

ঋতুচক্রে কাটে ক্লান্তি
হরে ক্লান্তি আসঙ্গ, কলহ,—
প্রণয়, বিরহ, মোহ,
কাম,ক্রোধ, প্রসিদ্ধ রিপুরা।
তবু রাত্রে জীর্ণ করে
আরো এক আশ্চর্য জঠর—
সমস্ত বর্ণের শান্তি
সর্বশেষ হৃদয়-কোটর।

ব্যাধ মৌনী, মূঢ় পিণ্ড।
ইন্দ্রিয়েরা নিস্তেজ কুকুর।
চন্দ্রহীন অন্ধকারে
অবলুপ্ত চেতনার ঝড়।
থাকে শুধু রবহীন,
বর্ণহীন, ঘ্রাণহীন প্রাণ—
স্পর্শহীন, স্বাদহীন,
মৃত্যুহীন, আত্মময় বাণ।

সেই বাণে বিদ্ধ প্রাণ
খোঁজে মুক্তি,—কোথায় শিকার?
কোথায় শিকার, প্রশ্ন,—
সর্বকণ্ঠে—কোথায় শিকার ?

ধূসর সনেট

বটকৃষ্ণ দে

(চতুর্থ বর্ষ—সাহিত্য)

তারপর পৃথিবীর উপান্তের-ও প্রান্তে এসে আজ দাঁড়ালাম
অশ্রু-আঁকা রিক্ত চোখে। ব্যথায় হলুদ-হওয়া কামনার কণা
একে একে সব ঝ'রে গেছে, হায় ম'রে গেছে। মৃত্যুর প্রণাম
বুকে ছুঁই। মনে পড়ে, তবু মনে পড়ে, কতো বাসন্তী বাসনা
একদিন বসন্তের বর্ণ-গন্ধ-ছন্দ-রাগে বিকশিত ছিলো—
আরো ছিলো চান্দ্র-নীল, নক্ষত্রের নীলিমার সুবিশাল প্রাণ
গানে-গানে পূর্ণতরো। আজ তারে মেঘ-হতে কে যে মুছে দিলো
সেই সব সূর্য-স্বপ্ন, শান্তি,সাধ,রাত্রি, চাঁদ, সৌন্দর্যের দান !

এখানে ধূসর মন, পাণ্ডুলেখ্য লেখে শুধু ধূসর স্মরণ—
জীর্ণ-জিজ্ঞাসায় ভরা। সবুজ স্বপ্নের সুর দূরান্তে বিলীন !
রক্তের দানেও এতো, কাঁচা-কচি ফসলের ফাগুন-গুঞ্জন
জাগে না। নামে না মেঘ ছেয়ে দিতে মরুতীর ছায়া-স্বপ্নহীন !
তবু আমি এই সব ঘোলা-ঘুণাক্ষরে-বাঁধা ধূসর সনেটে
লিখে চলি সূর্য্য-প্রেম, আলোকের স্বপ্ন-তীর্থে পথ চলি হেঁটে!

"ফসিল"

শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায়
(তৃতীয় বর্ষ—বিজ্ঞান)

আমি ভালোবাসি ভাই
ধূসর শিলায় ভরা দেশ—
যেখানে আকাশ নেই,
আদিঅন্ত পাহাড়ের সারি,
যেখানে ভাঙে না ঘুম পাখীর কূজনে,
ক্লান্তডানা প্রজাপতি বসে না কোথাও।
আমি ভালোবাসি সেই মুখর মৌনতা,
ভালবাসি প্রস্তরের গান।

তুমি ভয় পাও ?
ভয় পাও দেখে দেখে রূঢ় রুক্ষ শিলার ভ্রূকুটি ?
ক্লান্তি আনে দুই চোখে অনাদ্যন্ত পাহাড়ের সারি ?
চাও তুমি শ্যামল পূর্ণতা ?
ভালোবাসো তুমি ভাই অলৌকিক আকাশের নীল ?
আমি ভালোবাসি এই বিনিঃশেষ অসীমের সুর,
অভ্রভেদী শিখরের ধারালো ঋজুতা,
আপনারে খুঁজে পাই নিরাবেগ নিভৃতির মাঝে।

আমি এক ভূতাত্ত্বিক কবি,
ক্ষ্যাপার মতন আমি খুঁজে খুঁজে ফিরি—
পরশপাথর নয়, নয় কোনো মৌক্তিক প্রস্তর,—
বেসল্টের স্তরে স্তরে—কোয়ার্টজ্—গ্র্যানিটে
খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজি আমি ফসিলের কোনো অবশেষ,

আদিম যুগের কোনো উদ্ভিদের অথবা জন্তুর
শিলীভূত দেহ আমি খুঁজে যাই পর্বতে-প্রান্তরে।
আগ্নেয় শিলার যতো প্রস্তরে প্রস্তরে,
পালল শিলার স্তরে স্তরে
ফসিল বেড়াই খুঁজে—একা একা এই মোর খেলা।
এরাই আমাকে দেয় অন্ধকারে আলোর নিশানা,
অবলুপ্ত সৃষ্টির ইশারা।

একদিন নেবুলার আকর্ষণ বেগে
শূন্যপথে ছুটেছিলো সূর্যের এই ভগ্ন-অবশেষ,
সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে শুরু হোল সূর্য-পরিক্রমা।
সেদিন পৃথিবী ছিলো প্রজ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড শুধু,
তারপর ধীরে ধীরে হোল সে শীতল।
তখনো জন্মেনি জীব—
আদিম যুগের সেই আদম আর ইভ্,
কিংবা মনু, কিংবা আর কেউ।

সেদিন পৃথিবী ছিলো শ্যামল উদ্ভিদ্-জালে ভরা,
আর ছিলো ঊর্মিল সাগর।
সেদিন ভেসেছে তারা সেল্‌ক্যার্কের মতো
যা কিছু দেখছি তার সকলের আমিই সম্রাট্।
অবক্ষয়ী কাল-চক্র ধীরে ধীরে হোল আবর্তিত,—
প্রথম যুগের সেই প্রথম উদ্ভিদ্
ধূসর শিলার বুকে রেখে গেলো চিহ্ন তার অক্ষয় অক্ষত।
তারপর এলো জন্তু, এলো কতো প্রাণী,
যাবার বেলায়
তারাও প্রস্তর-পটে আপনার ছবি এঁকে গেলো,
যুগান্তের সৃষ্টির চাপে হোল তারা ভূগর্ভে প্রোথিত—
তারপর হোল যে ফসিল।

তাই খুঁজে বেড়াই ফসিল।
ফসিলের বুকে আছে অলিখিত কতো ইতিহাস,
প্রাগৈতিহাসিকের যে কথা আজিও অজ্ঞাত—
পাই আমি তাহারি সন্ধান।
ফসিল—সে যেন এক প্রাচীন কুঞ্চিকা—
তাই দিয়ে খোলা যায় অতীতের রুদ্ধ দ্বার,
অন্ধকারে জ্বালা যায় আলো।
আমি যে দেখেছি ভাই ফসিলের গায়
অলেখা ভাষায় লেখা থাকে কতো গুপ্ত ইতিহাস
সে লেখা পড়তে পারো?—
আমি পারি, আমি পারি ভাই,
আমি এক ভূতাত্ত্বিক কবি।
ছুসাল মাহাতো কতো, কতো দধীচির হাড়
ফসিলের মাঝে পেলো রূপ।
ফসিলের মাঝে আমি খুঁজে পাই কতো উপাখ্যান,
শতাব্দী-সঞ্চিত কতো ইতিহাস বলে যায় তারা—
আমি তারে করি উন্মোচন।
আমার উৎসুক মন খেলা করে ফসিলে-প্রস্তরে।

তুমি ভালোবাসো ভাই আকাশের নিঃসীম নীলিমা?
ভালোবাসো ঘাসের সবুজ?
আমি ভালোবাসি ভাই ধূসর-পিংগল-গৈরিক
প্রস্তর-অরণ্যে ঘেরা অতীতের ফেলে যাওয়া ছাপ।
তাই আমি খুঁজে ফিরি অরণ্যে-পর্ব্বতে-প্রান্তরে—
পরশপাথর নয়, নয় কোনো মৌক্তিক প্রস্তর—
অতিক্রান্ত অতীতের জন্তুর দন্তুর অবশেষ,
আর শুনি প্রস্তরের গান।

প্রথম ও শেষ

প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য্য
(চতুর্থ বর্ষ—বিজ্ঞান)

এসেছে সে
আলোকের বেশে ;
আকাশের দূর প্রান্ত হতে,
সুরস্রোতে
বাহিয়া উজান,
গাহি গান,
সে এসেছে নামি ;
চিনি তারে আমি,—
স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিতা,
সে আমার প্রথম কবিতা।

এসেছে সে
আগুনের বেশে ;
ধরণীর বক্ষ ভেদ করি
উঠেছে সে ; মৃত্যু তার আছে হাত ধরি ;
বসুধা
মেটাতে পারে নি তার ক্ষুধা,
সে তাই গ্রাসিতে চায় আপনারে ;
চিনি আমি তারে,—
রূপহীনা, সুরহীনা, আনন্দবঞ্চিতা,
সে আমার শেষের কবিতা ॥

শ্রাবণের সায়াহ্ন যূথিকা

সুশান্তকুমার ঘোষ
(ষষ্ঠ বর্ষ—আর্টস)

সবার অজ্ঞাতে ছিল অবজ্ঞাত অখ্যাত আবাসে
সামান্য ফুলের চারা। কোনদিন কোন সন্ধ্যাকাশে
পড়েনি তাহার ছায়া। কোনদিন বীণার ঝংকারে
জানিনে তো সাড়া তার ফিরে গেছে কি না বারেবারে।

তবু তো জেনেছি আজ, ছোট যারে ভাবি সে তুচ্ছ না।
সারা চিত্ত জুড়ে মোর জাগাইল অমর্ত্ত্য মূর্চ্ছনা।
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জিনি প্রতি মুহূর্ত্তের ভয়।
আজি তো উদ্‌বারি দিল আপনার সফল সঞ্চয়।
কখন্ সবুজে দেখি শ্বেতাক্ষরে কী যেন কী লিখা—
জানিনে কীসের তাপে ফুটেছিল একটি যূথিকা॥

এতদিন যা আছিল আপন গোপন গন্ধে লীন,
অদৃশ্য অঙ্গুলি তার বাজাইল অমরার বীণ্
অকস্মাৎ। কখন্ সহসা বৃষ্টিভরা সন্ধ্যায় শাঙনে
খ্যাপামির তালে তালে গন্ধটুকু এনেছে প্রাঙ্গণে
অধরার স্পর্শমাখা। বুলাল রসের তুলি তার
সারাটি অন্তরে মোর। রসাবেশে ভুলাল সংসার।

আজ দেখি ডালে ডালে শুধু যূথীমুকুলের পালা,
কার আগমনী রচি সাজায়ে ধরেছে তার ডালা
কৌতূহলী। চেয়ে দেখি—কী শ্যামল এই সমারোহ—
এ মাটির বন্ধ হতে মুক্তি মাগি অনন্ত বিদ্রোহ॥

মনে ভাবি, হে যূথিকা, তাই তব গন্ধের আড়ালে,
নন্দন-অপ্সরী তার নৃত্যচ্ছন্দে মাঙ্গল্য বাড়ালে।
মর্ত্ত্যের আবর্ত্ত মাঝে স্বর্গের অমৃত রস ধারা
মাঙ্গলিক আঁকি দিল, মৃত্তিকায় নব বসুধারা!

সংসারে উচ্ছিষ্ট যতো তবে এই সৃষ্টিছাড়া স্রোতে
ভেসে যাক। ওগো ফুল, করেছো কী সম্মোহ বিস্তার!
তোমারি বন্দনা রচি! হে অনিন্দ্য, দিও না নিস্তার
না পারি ধরিতে যদি গন্ধের আভাসটুকু তব
ছন্দে মোর। হে অম্লান, ও সুরভি; নিত্য নব নব
যাত্রাপথে দিবে মোরে দূরতম পথের পাথেয়!
স্মরণে রহিবে নিত্য শ্রাবণের সায়াহ্ন যূথিকা,
সুন্দরের জয়ধ্বনি তুমি তার নিত্য জয়টীকা॥

উৎসর্গ

শ্রীভুষারকান্তি ঘোষ

(দ্বিতীয় বর্ষ—সাহিত্য)

রাজ্য নিয়ে রয় যে সুখে ধার্য ফসল জুগিয়ে প্রজার থেকে
তাঁদের কথা বল্‌ছিনাকো ধরছিনাকো চোখের 'পরে এঁকে।
সৌখ্য যাঁদের মুখ্য কথা তাঁদের কথা মনেই দিলুম রেখে।

হাওয়ায় ওড়ে চিত্র-আঁকা বিচিত্র মহার্ঘ পোষাক যাঁদের,
অর্থ যাঁদের খোলামকুচি, নিত্য লভেন খাদ্য নানা স্বাদের,—
রিক্ত কবি শক্ত নয় যে ব্যক্ত কর্‌বে হর্ষ-ধারা তাঁদের।

আবাস-হারা শান্তি-হারা—শ্রান্তি এবং ক্লান্তি যাদের সাথী,
ক্ষুব্ধ হৃদে যুদ্ধ ক'রে রক্ষা করে আত্মা দিবস-রাতি—
সেই অভাগ্য লক্ষ্মী-ছাড়ার উদ্দেশে আজ জ্বাল্‌বো আমার বাতি।

যুদ্ধ যারা করছে মিলে, মরছে লাখে, ধরছে কোটি মাটি,
ভগ্ন যাদের হস্তপদ, লগ্ন ভ্রমে রক্ত মাথা ফাটি'—
তাদের কথাই ছন্দে বেঁধে আনন্দেতে সাজাই পরিপাটি।

পদক-ভারে নত যাঁরা, রাজায় যাঁরা তোষামোদে ভুলোয়,—
যুদ্ধশেষে গর্ব-বশে খট্‌খটিয়ে অশ্ব-খুরের ধূলোয়
যুদ্ধ-জয়ের যশ যাঁরা নে'ন,—তাঁদের কথা নেই এ পঙক্তি-গুলোয়।

সত্যি যারা রক্ত দিয়ে—প্রাণটা দিয়ে যুদ্ধ-জয়ের কারণ,
যাদের শক্তি-শৌর্য-বলই দেশ-শাসকের বিঘ্ন-বিপদ-তারণ,—
নাম-হারা সেই দুর্ভাগাদের বীর্যগাথার আমিই কবি চারণ।

দেশ-শাসনের সিংহাসনে আসীন যাঁরা তাঁদের কথা নয়,—
দেশের মাটির খাঁটি লোকের কথাই মোরে বল্‌তে হেথায় হয়—
ভারী বোঝা বইছে যারা, ঘর্মে যাদের চর্ম জলময়!

ওই যে যারা নৌকো 'পরে—দু'হাত দিয়ে চ'লছে বেয়ে তরী,
এগিয়ে চলার গাইছে যে গান,—তাদের আমি ভক্তি-ভরে বরি—
বিপদ-মাঝে যোঝে যারা—সেই সাহসী দেশবাসীরেই স্মরি।

আনন্দ ও হর্ষেরে যে ছন্দে বেঁধে বরবে, ও ভাই, বরুক,
চক্‌মকানি মুদ্রাদেবীর ভক্ত যাঁরা ভক্তি তাঁরে করুক,—
এ-পৃথিবীর ধূলি শুধু—শুধু ঘৃণা ভাগ্যে আমার পড়ুক্।

তাঁদের তরে থাকুক যতো বিশ্ব-জোড়া ধন-সম্পদ, ভাই,—
আমার তরে থাকুক শুধু ধূলি-বালি, থাকুক শুধু ছাই,—
এদেরই গান গাবো আমি,—এর চেয়ে আর অধিক আশা নাই! *

---

*রাজকবি মেস্‌ফিল্‌ড্‌-এর 'A Consecration'-কবিতার মর্ম্মানুবাদ

আমাদের কথা

ষ্টুডেন্টস্ য়ুনিয়ন কাউন্সিল ১৯৪৯—৫১

বাৎসরিক কার্য্যের সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সাধারণ বিভাগ ঃ

বর্তমান বৎসরের ছাত্র পরিষদের বিদায় লগ্ন সমাগত। ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক মহাশয়দের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের মূল্যবান উপদেশ, পরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতার জন্য।

ছাত্র বন্ধুদের আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের সাহায্য এবং সহানুভূতি স্মরণীয়।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরিষদ এবার তার কাজ চালু করতে পারেনি এবং এর জন্য সদস্যগণ ও বিভিন্ন কর্ম্ম-সচিবগণের মধ্যে কোন কোন সময় পারস্পরিক অসহযোগিতা অংশতঃ দায়ী। তথাপি এ কথা বলব যে বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকেরা তাদের নির্ধারিত কর্ম্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন।

প্রতিষ্ঠা-সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাধারণ বিভাগের পরিবেশনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় বিজ্ঞান-গ্রন্থাগারে। ইন্দিরা সিনেমা হলে 'Of Human Bondage' নামক চলচ্চিত্রটি দেখান হয়। আরও কয়েকটি সবাক চিত্র পদার্থ বিভাগের বক্তৃতা গৃহে দেখান হয়।

পরবর্তী অনুষ্ঠান হয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বিদায়-অভিনন্দন উপলক্ষে। এর পরেই আসে দুঃস্থ বাস্তুহারাদের সেবার জন্য দেশব্যাপী আহ্বান। এই বিরাট আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের শত শত ছাত্র আপ্রাণ সেবা করেছে, করেছে আর্থিক ও শারীরিক সর্ব্বপ্রকার সাহায্য। তাই আমাদের কলেজের ছাত্ররা ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে তৎকালীন পরীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে যে সহানুভূতি দেখান তার জন্য তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ। কলেজের বাস্তুহারা ছাত্রদের কিছু বৃত্তি সাহায্য করা হয়।

কলেজ য়ুনিয়নের এবং কলেজের অন্যান্য কার্য্যাবলী একমাত্র বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা মারফৎ প্রকাশ করা দুরূহ বলে মাঝে মাঝে ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্কল্প করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের এই উদ্যম একটির বেশী 'প্রকাশনী' প্রকাশে সফল হয়নি। আশা করি ভবিষ্যৎ কর্ম্মকর্তারা আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত করে তুলতে সক্ষম হবেন।

এ যাবৎকাল য়ুনিয়ন কার্য্যালয় না থাকায় যে অসুবিধার সৃষ্টি হ'ত তা এবার দূরীভূত হয়েছে। এর জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলেজের অভ্যন্তরে একটি স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার-ঘর থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। ডাঃ যতীশ সেনগুপ্ত অধ্যক্ষ থাকা কালীন এ বিষয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। আশা করি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে।

ছাত্রদের সাহিত্য প্রকাশনার সহজ ব্যবস্থা হিসাবে প্রাচীর পত্র 'দেয়ালী' নিয়মিত প্রকাশের যথাসাধ্য সুন্দর ব্যবস্থা আমরা করেছি।

সাধারণ বিভাগের অধীনে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে এবার প্রথম শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত হয়। আশা করা যায় এই বাহিনী একটি কর্ম্মতৎপর স্থায়ী বাহিনী রূপে জনপ্রিয়তা অর্জ্জনে সক্ষম হবে।

PRESIDENCY COLLEGE ATHLETIC COMMITTEE

SESSION—1949-50

Left to Right

1st row :—A. Mukherji (Tennis Capt.), Sm. T. Ghosh (Small Area Games Secy.), Prof. N. G. Chakrabartty, Sj. N. N. Chatterji (Physical Instructor), Prof. J. C. Sen Gupta, Prof. S. K. Indra, Prof. S. Roy, Dilip Datta (General Secy. & Football Capt.).

2nd. row :—Tarun Bose (Cricket Secy.), Amal Sen (Tennis Secy.), A. M. Roy (Hockey Secy.), D. Banerji (Football Secy.), S. Chatterji (Rowing Secy.), B. Roy, Subir Bose, P. Sen, D. Das, G. Danda, B. Das Gupta.

3rd row :—Srikanta (Bearer), Narsingh (Bearer), S. Bose, S. Biswas, M. Lahiri, S. Karmakar, S. R. Biswas, K. Chowdhury, B. R. Hussain (Badminton Capt.), S. Sen, A. Majumdar, P. Guha Thakurta, S. Lahiri, D. Chanda.

PRESIDENCY COLLEGE CRICKET MATCH

PAST *vs.* PRESENT: Saturday, 14th January 1950

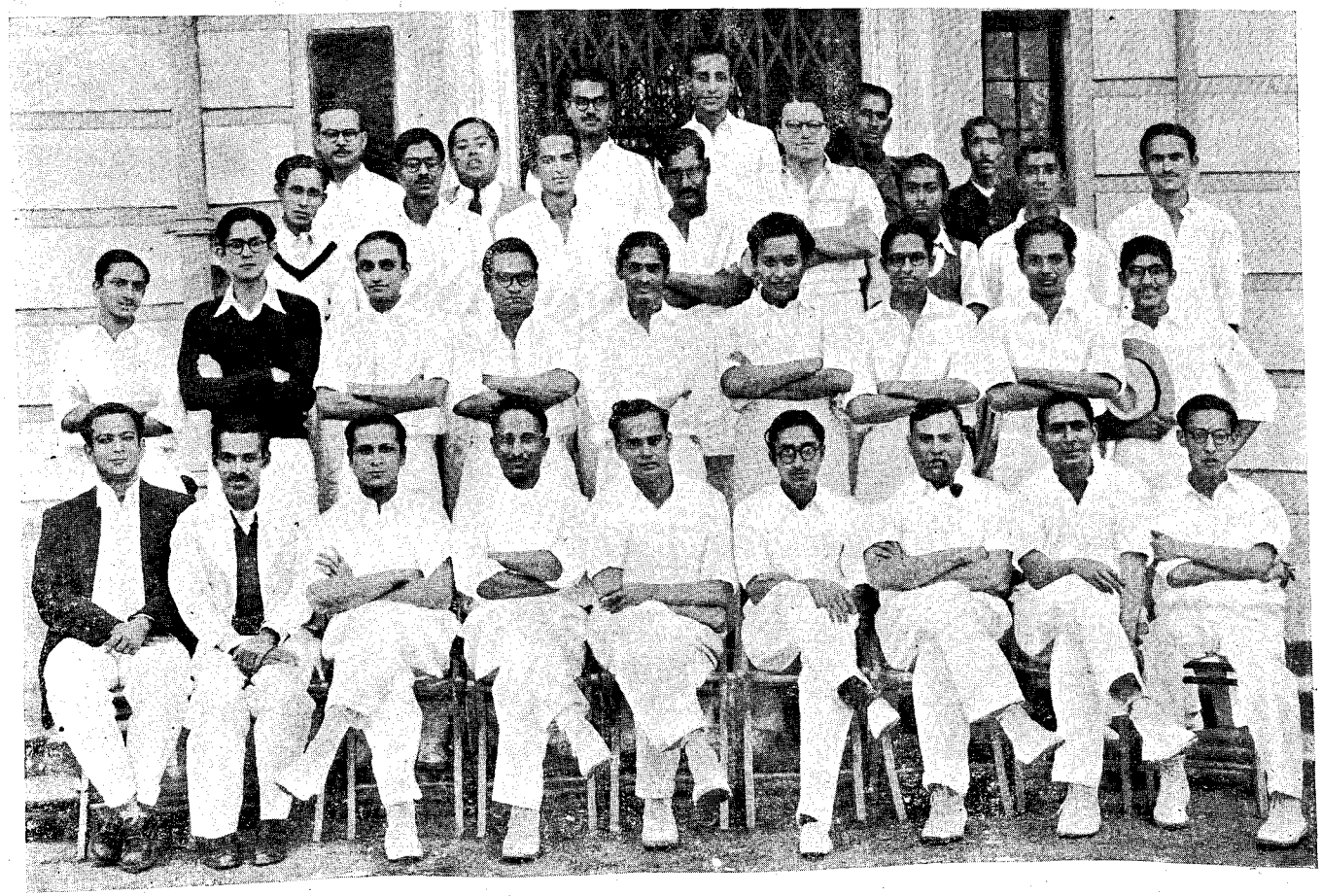

Left to Right

1st Row :—Prof. A. W. Mahmood, N. N. Chatterjee (Physical Instructor), S. Mitter, A. Das, Niren De (Capt.-Past), Naren Basak (Capt.-Present), K. L. Ray, N. Chatterjee, D. R. Das.

2nd Row :—Arun Ray, A. Mukherji, P. Das, K. Deb, P. Mitter, Arabinda Ray, S. Basu, S. Das Gupta, P. Sinha.

3rd Row :—D. Dutta, A. Chatterjee, P. B. Dutt, A. Bose, Siddhartha Ray, A. Sen, M. Lahiri, Provash Roy.

G. Gilani, R. Mitter, Narsingh (Bearer), Srikanta (Bearer).

পূজাবকাশের পর সমাজ সেবা বিভাগের সহযোগিতায় চিত্রা সিনেমা হলে 'The Russian Story' এবং 'সমাধান' নামক দুটী ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

নাট্যবিভাগ এবার বড় নাটক না করে শ্রীরঙ্গম্ হলে ছোট অভিনয় হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ' মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ানুষ্ঠানের পূর্বে জলসার ব্যবস্থা হয়। এই প্রসংগে কলেজে একটি হল নির্ম্মাণের আশু প্রয়োজনের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বহু আছেন। এমতাবস্থায় আমাদের দাবী পূর্ণ না হওয়া অতিশয় দুঃখের বিষয়।

বিতর্ক বিভাগের কর্মক্ষমতা যথানিয়মে এগিয়ে গেছে।

রবীন্দ্র পরিষদের কর্ম্মপদ্ধতি গত কয়েক বৎসরের ধারাকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মারফৎ বাস্তুহারাদের সাহায্য করায় শ্লাঘাও বোধ করতে পারে এই পরিষদ।

'বিরাম পীঠিকা' বিভাগ ষ্টীমার পার্টির উৎসব না করে রাষ্ট্রবিপ্লবের বলি বাস্তুহারাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে ধন্য হয়েছে।

কলেজের ক্যাশ ডিপার্টমেণ্ট এবং লাইব্রেরীর উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন। কলেজ রেজিষ্টার সংস্কার বা নতুন করে প্রণয়ণের জন্য অধ্যাপক, প্রাক্তন ছাত্র এবং লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্তদের ও হিতৈষীদের উদ্যোগী হতে অনুরোধ করছি।

সকলকে আমার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

হৃষিকেশ বন্দোপাধ্যায়—সাধারণ সম্পাদক।

খেলাধুলা বিভাগ :

১৯৪৯-৫০ সালের কার্য্য বিবরণী

সভাপতি—অধ্যক্ষ ডাঃ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ; সহঃ সভাপতি —ডাঃ নির্মল সেন ; শ্রীযুক্ত এন্, এন্, চ্যাটার্জ্জি।

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীসূর্য্য চ্যাটার্জ্জি (তৃতীয় বর্ষ—কলা)। ক্রিকেট সম্পাদক—শ্রীঅরুণ রায় (তৃতীয় বর্ষ—কলা), টেনিস্ সম্পাদক—শ্রীপ্রবীর বসু (চতুর্থ বর্ষ—বিজ্ঞান), হকি সম্পাদক—শ্রীগুরুপদ দ্বন্দ (চতুর্থ বর্ষ—বিজ্ঞান), ভলি, বাস্কেট্‌বল, ব্যাডমিণ্টন্—শ্রীঅমল সেন (চতুর্থ বর্ষ—কলা), বাচ্ খেলা—শ্রীপ্রবীর সেন (তৃতীয় বর্ষ—বিজ্ঞান), ফুট্‌বল—শ্রীসলিল লাহিড়ী [চতুর্থ বর্ষ—বিজ্ঞান] গার্লস সেকশান—শ্রীমতি নন্দিনী জানা [তৃতীয় বর্ষ—কলা]

১৯৫০-১৯৫১ সালের কার্য্যকরী সমিতি

অন্যান্য বারের ন্যায় যথারীতি বিভিন্ন শ্রেণীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা খেলা ধূলা সমিতি গঠিত হয়। অধ্যাপক নির্ম্মল সেনের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক যতীশ সেনগুপ্ত ক্রিকেট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনোনীন হন। টেনিস্ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যপক শ্রীযুক্ত সুনীত ইন্দ্র নৌ-পরিচালনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন এবং টেনিস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আসেন অধ্যাপক মাহ্‌মুদ। এই বৎসরের কাজকর্মের সংবাদ সংক্ষেপে এই :—

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—গত ১২ই জানুয়ারী ১৯৫০ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকুলদাচরণ দাসগুপ্ত এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীযুক্তা জে, ঘোষ। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপে এবার চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণার ছাত্রদ্বয়—শ্রীসন্তোষ কর্মকার এবং শ্রীপ্রবীর গুহঠাকুরতার মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা হয়। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকর্ম্মকারই ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান্‌শিপ্ লাভ করেন। অন্যান্য বারের ন্যায় আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ সেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। বাৎসরিক প্রতিযোগিতার সময় শ্রীঅরবিন্দ রায় এবং শ্রীরাসবিহারী বসুকে যথাক্রমে ক্রিকেট ও ফুটবল 'ব্লু' দেওয়া হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাজে শ্রীকৃষ্ণকুমার সায়গল বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

ফুটবল : এই বিভাগের সম্পাদক এবং অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীধ্রুব ব্যানার্জ্জি এবং শ্রীদিলীপ দত্ত। প্রীতিমূলক কয়েকটী খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েকটী ট্রায়াল ম্যাচের পর কলেজ টিম্ গঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীগে আমাদের কলেজ আমাদের গ্রুপে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। হেরম্ব মৈত্র শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে আমাদের কলেজ সেণ্ট জেভিয়ার্সের কাছে পরাজিত হয়। এসকল খেলা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা কয়েকটী সৌহার্দ মূলক ক্রীড়ার ব্যবস্থা করে। অধ্যাপক মাহ্মুদ ও অধ্যাপক বি, সি. মুখার্জ্জি এই সকল খেলায় যোগদান করে খেলাগুলিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন। শান্তিনিকেতনের স্থানীয় দলের সহিত আমাদের কলেজ এক প্রীতিমূলক খেলায় মিলিত হয় এবং উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া নৈপুন্যের পরিচয় দিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

ক্রিকেট : এই বিভাগের সম্পাদক এবং অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে তরুণ বোস ও নরেন বসাক। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহন-বাগান, বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব প্রভৃতি শক্তিশালী দশটী ক্রিকেট দলের সঙ্গে এ বৎসর আমাদের কলেজের প্রীতিমূলক খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। নেট্প্র্যাকটীস্ এবং অন্যান্য অনুশীলন ক্রীড়ায় ছাত্রদের মধ্যে অধিক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ আশুতোষ কলেজের কাছে পরাজিত হয়।

কলেজ প্রতিষ্ঠা সপ্তাহে প্রাক্তন বনাম বর্ত্তমান ছাত্রদের এক প্রদর্শনী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। শ্রীনীরেন দে'র অধিনায়কত্বে শ্রীনির্মল চ্যাটার্জ্জি, শ্রীপি, বি, দত্ত প্রমুখ সাতজন বাংলার প্রাদেশিক খেলোয়ার দ্বারা গঠিত প্রাক্তন দলই জয়লাভের সম্মান অর্জন করে।

বাংলার ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হ্যারী পার্কসের নিকট শিক্ষা গ্রহণার্থে অমাদের কলেজের জনাব মনসুর জিলানী এবং শ্রীঅরবিন্দ রায় মনোনীত হন।

টেনিস : অমল সেনের পরিচালনাধীনে এবং শ্রীঅজিত মুখার্জির নেতৃত্বে একটী শক্তিশালী টেনিস্ দল এবৎসর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এবৎসর টেনিস ক্লাবের সভ্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। গত কয়েক বৎসর এত অধিক সংখ্যক সভ্য এই বিভাগে দেখা যায়নি।

আন্তঃকলেজ 'উইণ্টার কাপ' প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে সেণ্ট জেভিয়ার্সের নিকট এবং 'ডিউক কাপ' প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বি, ই,-কলেজের নিকট আমরা পরাজিত হই। কলেজ প্রতিষ্ঠা সপ্তাহে প্রাক্তন বনাম বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটী প্রদর্শনী টেনিস্ খেলার আয়োজন করা হয়। "ইনট্রা কলেজ চ্যাম্পিয়ান্শিপে" সিঙ্গলসে শ্রীমনমোহন লাল বর্ম্মন এবং ডাবল্সে শ্রীঅমিত মুখার্জ্জি এবং শ্রীঅরবিন্দ রায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন।

আমাদের কলেজের পাঁচজন ছাত্র—মনমোহন লাল বর্মণ, অমিত মুখার্জি. অরবিন্দ রায়, প্রভাস রায়, এবং অমল সেন ইউনির্ভাসিটী লনে মিঃ এস, জি, ম্যাথুএর ছাত্র হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ, বি, এল, টী,এ কর্তৃক ছাত্র হিসাবে গৃহীত হবার জন্য আমরা শ্রীমনমোহন লাল বর্মণকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অধ্যক্ষ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ এবং শ্রীমনমোহন বর্মণ বনাম অধ্যাপক মাহ্মুদ ও শ্রীঅরবিন্দ রায়ের ডাবল্স প্রদর্শনী খেলাটী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

হকি : শ্রীঅশোকমোহন রায়ের পরিচালনাধীনে এবং শ্রীঅমল চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে এবার আমাদের হকি দল গঠিত হয়। গতবারের ন্যায় ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন এবার সম্ভব হয় নি। আন্তঃকলেজ লীগে আমরা আমাদের গ্রুপে চতুর্থ স্থান অধিকার করি। নক্ আউট্ প্রতিযোগিতাতেও শ্রীআশুতোষ চৌধুরী কাপ্ এবং এস, আর, দাসগুপ্ত কাপ্-এ আমরা পরাজিত হই।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বর্ত্তমান বনাম বিদায়ী ছাত্রদের মধ্যে এক প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা হয়। বিদায়ী দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে।

ভলিবল, বাস্কেটবল এবং ব্যাড্‌মিণ্টন্ঃ এই তিনটী বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত ছোট খাট খেলা ধূলা বা Small Area Gamesএর পরিচালিকা ছিলেন শ্রীমতী তুহিনা ঘোষ।

বহু সংখ্যক ছাত্র ভলিবল অনুশীলনে নিয়মিত যোগ দেয়। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় আমরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর স্কটীশ্‌ চার্চ্চ কলেজের নিকট পরাজিত হই। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীকে পরাজিত করে আন্তঃ ক্লাশ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। এবৎসর ছাত্রীদেরও ভলিবল অনুশীলনে যোগদান করতে দেখা যায়।

ব্যাডমিণ্টন খেলার ব্যবস্থা কেবলমাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিলাল রাজ হোসেনের নেতৃত্বে আমাদের কলেজ আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। আমরা এই প্রতিযোগিতায় স্কটীশ্‌ চার্চ্চের নিকট পরাজিত হই।

কলেজের ছাত্রীরা নিয়মিত ব্যাডমিণ্টন এবং টেনিকোয়েট্‌ অনুশীলনে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ এবং অধ্যাপক সুনীত ইন্দ্র এক প্রদর্শনী ডাবল্‌স্‌ খেলায় রেখা চালিয়া এবং সন্ধ্যা ঘোষের নিকট পরাজিত হন।

নৌ-পরিচালনা সমিতি ঃ এ কলেজের নৌ-পরিচালনা সমিতি বিশেষ বিখ্যাত। এ বিভাগের পরিচালক এবং অধিনায়ক ছিলেন শ্রীসূর্য্য চ্যাটার্জ্জি এবং শ্রীদীপক ভট্টাচার্য্য। আমাদের কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅজয় লাল বসু 'অল্‌ ইণ্ডিয়া রেগাটা' প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব কর্‌বার জন্য মনোনীত হন। আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ব্যায়ামাগার ঃ গড়পড়তায় প্রায় ত্রিশজন ছাত্র ব্যায়ামাগারে নিয়মিত ব্যায়াম করেন। সাধারণতঃ ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসের ছাত্ররাই এখানে বিশেষ ভাবে ব্যায়ামের সুযোগ পান।

প্রত্যেক বারই আমরা আবেদন জানিয়ে আসছি আমাদের বার্ষিক দান এক হাজারকে বাড়িয়ে দু-হাজার করা হোক। আর ছাত্রদের চাঁদা চার টাকা হতে পাঁচ টাকা করা হোক।

আমাদের সকল কাজে আমাদের ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীযুক্ত এন, এন, চ্যাটার্জ্জি যে সাহায্য করেছেন তা উল্লেখ না করলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের।

শ্রীদিলীপ দত্ত—সাধারণ সম্পাদক।

বিতর্ক-পরিষদ ঃ

গত বৎসরের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীঅনিন্দ্য দত্তের কাছ থেকে কার্য্যভার গ্রহণ করে অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদারের সভাপতিত্বে এবৎসরের বিতর্ক-পরিষদের কার্য্য সুরু হল। শ্রীপ্রবীর ঘোষ তৎকালীন প্রথম বার্ষিক বিতর্ক-পরিষদের উদ্বোধন করলেন। এর পর বিভিন্ন কলেজ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের কলেজের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র পরিচালিত বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা সাফল্যের পরিচয় দেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর "Korean War" সম্বন্ধে একটি

Symposium অনুষ্ঠিত হয় ফিজিক্স থিয়েটারে অধ্যক্ষ জে, সি, সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে। বহু ছাত্র এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে শ্রীদুর্গা চরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রবীর ঘোষ এবং শ্রীঅমিতাভ দে। এর কিছুদিন পর অধ্যাপক অমিয় মজুমদারের সভাপতিত্বে "Romanticism should have no place in modern literature" শীর্ষক বিষয়ে একটি বিতর্ক হয়। শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীসমীর রায় এই বিতর্কে সাফল্যের পরিচয় দেন। বিরাট ছাত্র সমাবেশের মাঝে "গান্ধীবাদ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পরিপন্থী" এই বিষয়ে পরিষদের তৃতীয় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হল ৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। শ্রীদুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী এই বিতর্কে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাঝে ছাত্র এবং অধ্যাপকদের একটি সম্মিলিত বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হল পূজার ছুটির কিছু আগে। বিষয় ছিল "The U. N. O. has ceased to be a democratic organisation"। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীতরুণ সরকারের বক্তৃতা অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছিল। এর পর এবারকার প্রথম বার্ষিক বিতর্ক-পরিষদের উদ্বোধন করা হল।

এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

আর একটা কথা—প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রী সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু বিতর্কে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে কোন ছাত্রীকেই দেখা যায় না।

সর্ব্ব শেষে আমি বিতর্ক-পরিষদের তরফ থেকে বিভাগীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আরও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক এবং ছাত্রের কাছে বিতর্ক-পরিষদের কাজের সাফল্যের জন্য ঋণ স্বীকার করছি।

প্রবীর ঘোষ —বিতর্ক সম্পাদক।

জুনিয়র কমন রুম ঃ

প্রথমেই গর্বের সংগে জানাচ্ছি যে অন্যান্য বারের মত এবার জুনিয়ার কমনরুমের তরফ থেকে কোন ষ্টীমার পার্টির বন্দোবস্ত করা হয়নি। সেই বাবদ বরাদ্দ টাকাটা সর্বসম্মতিক্রমে উদ্বাস্তু সাহায্য ভাণ্ডারে দেওয়া হয়েছে। জাতির চরম বিপর্য্যয়ের দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের এই সমাজ-সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা সত্যিই শুভ লক্ষণ।

এবছর উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে নতুন টেবল-টেনিস বোর্ড কেনা। এর অভাব অনেকদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। বছরের প্রথমে আন্তঃকলেজ টেব্‌ল্ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমরা চাম্পিয়ন হয়েছি। এবছরই প্রথম আন্তঃশ্রেণী টেনিস প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপনাও দেখা দিয়েছে যথেষ্ট।

পঠন-বিভাগে বিভিন্ন ধরণের সাময়িকীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তার মধ্যে Blitz, Sankar's Weekly, Sport & Pastime প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রীদের কমনরুমে সম্পাদিকা নির্বাচিতা হয়েছেন শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়; সেখানে একটি ক্যারম বোর্ড ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম এবছর দেওয়া হয়েছে। প্রসংগতঃ বলে রাখি যে সেখানে স্থানাভাব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছে।

ছাত্রদের কমনরুমে স্থানাভাবের অভিযোগটা অনেক কালের। কিন্তু আজো এগারশ ছেলের অবসর কাটানোর জন্যে সেই একটি নাতিবৃহৎ কক্ষই বরাদ্দ রয়েছে।

এবার কমনরুমে কয়েকটি আইন-কানুনের কড়াকড়ি করায় অনেকে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন; কেউ কেউ সেটা মান্‌তে চাননি, অথচ কমনরুমের শৃংখলা রক্ষার্থে সেগুলি ছিল অপরিহার্য্য।

শ্রীসুব্রত সিংহ—সম্পাদক, জুনিয়র কমন রুম।

ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাস সংসদ ঃ

আমাদের ছাত্রাবাস-সংসদ আর একটি বছর পার হয়ে এলো। এ বছরে ছাত্রাবাসকে নানা ঝড় ঝাপ্‌টার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো ; তা আমরা সাফল্যের সংগেই পেরিয়ে এসেছি।

ছাত্রাবাস সংস্কৃতি-বিভাগ থেকে এবার নববর্ষ, ১৫ই আগষ্ট, ২২শে শ্রাবণ ও ২৬শে জানুয়ারি দিবস পালন করা হয়। কবিগুরুর স্মরণোৎসবে আমরা শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, শ্রীযুক্তা ঘোষ ও অধ্যাপক ডাঃ সরোজকুমার দাশের সাহচর্য লাভ করেছি। এবারকার প্রতিটি উৎসবই বেশ উপভোগ্য হয়েছিলো।

আমাদের পাঠাগার-এর কাজও সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। বই কম কেনা হলেও ভাল বই আমাদের চাই-ই।

ক্রীড়াবিভাগ ছাত্রদের খেলাধূলায় বেশ মনোযোগী করে তুলেছে। আন্তঃ-ছাত্রাবাস ফুটবল প্রতিযোগিতা আমাদের পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয় ও বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রবাস তাতে বিজয়ী হন। Indoor Games এ আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে।

ছাত্র কল্যাণ-সমিতি তাদের উৎসাহ ও কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী হওয়া ছাড়াও তারা ফিল্‌ম শো এর আয়োজন করে ছাত্রদের প্রীতিভাজন হন।

আমাদের খাদ্য-সমিতি এবার নানা দুর্যোগের ভেতর দিয়েও সুব্যবস্থা বজায় রেখেছেন।

এবারকার সরস্বতী পুজো সত্যিই সুন্দর হয়েছিলো। বিশেষ করে আমাদের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান আবাসিক-দের প্রীতিসম্মেলন উৎসবটি প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু মহাশয়ের রসোজ্জ্বল ভাষণে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ছাত্রবাসের যে প্রধান অসুবিধা তা হলো একটি বেতার যন্ত্রের অভাব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেকখানি আনন্দের খোরাক থেকে আমরা বঞ্চিত রয়েছি। তাছাড়া ছাত্রবাসে আজকাল ৩০।৪০টি আসন শূন্য রয়েছে। কর্তৃপক্ষ যদি স্নাতকোত্তর ছাত্রদের এতে থাকবার অনুমতি দেন তাহলে ছাত্রাবাসের সেই আগেকার জমজমাট ভাবটি ফিরে আসে। এজন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ বছরে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভড় ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর সংগে আমাদের প্রাণের যোগ ছিলো ; সে জন্য তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমরা অধ্যাপক শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখার্জ্জিকে আমাদের নতুন তত্ত্বাবধায়ক রূপে পেয়েছি। এ অল্পসময়ের ভেতরই তিনি সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। আশা করি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ছাত্রবাসের উন্নতি অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে আমাদের ছাত্রবাসের হিতাকাঙ্ক্ষী সবাইকে সংসদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের যাত্রা-পথে তাঁদের অকৃত্রিম সহানুভূতি অক্ষয় হোক্।

শ্রীঅনিন্দ্য দত্ত—সহ-সভাপতি।

শ্রীঅরবিন্দ কুণ্ডু—সাধারণ সম্পাদক।

'বাংলা পাঠগোষ্ঠী' :

বাংলা পাঠগোষ্ঠীর সম্পাদক-পদের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটেছে বারে বারে। পূর্ব্বের সম্পাদকদ্বয় পাঠগোষ্ঠীর সম্পাদক পদের গুরু দায়িত্বভার [?] বহনে অক্ষমতা জানিয়ে পদত্যাগ কোরেছেন, ফলে এমনি অবস্থায় আমাকে এগিয়ে আসতে হোয়েছে। গত বৎসরের সম্পাদক এমন আশাও কোরে গেছেন যে যাতে তাঁদের অকথিত বাণা, অকৃত কার্য্য আমরা সফল কোরে তুলতে পারি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার কথা হোলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের পর পাঠগোষ্ঠীর বিশেষ কোন উন্নতি করা সম্ভবপর হোয়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে যে কয়েকটি বাধা ও ত্রুটি আছে তা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রথমতঃ আমাদের পাঠগোষ্ঠীর ঘরটি খুবই ছোট, এত ছোট যে মাঝে মাঝে সাহিত্যবিষয়ক যে অধিবেশন হয় তার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অন্য ঘরে তা করতে হয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেও কোন ফল হয় নি। দ্বিতীয়তঃ পাঠগোষ্ঠীর ব্যবহার্য্য যে পাঠাগারটি আছে তার বইয়ের সংখ্যা এত কম যে তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজন মত বই দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হোয়ে ওঠে না।

পাঠগোষ্ঠীর উদ্যোগে কিছুদিন আগে প্রাচীন কাব্য সাহিত্য মন্থনের ব্যবস্থা হয়েছিলো। পাঠগোষ্ঠীর পরবর্ত্তী অধিবেশন হয় গত ২৬শে আগষ্ট শনিবার। অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র প্রথম পর্য্যায় [১৯০০-১৯২৫ পর্য্যন্ত] আলোচনা করেন।

পাঠগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করা হোয়েছিল গত ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ জে, সি, সেনগুপ্ত মহাশয় এবং প্রধান-অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যসমালোচক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। অতুলবাবু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী একটি সুন্দর ও সরল বক্তৃতা দেন।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার দ্বিপ্রহরে অপরাজের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ৭৪তম জন্ম বার্ষিক উপলক্ষ্যে একটি স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়ে ছিলো। অনুষ্ঠানে শরৎ সাহিত্যের বোদ্ধা ডাঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীনির্ম্মলেন্দু মুখার্জ্জি, শ্রীমতী প্রীতি সুর ও শ্রীশুকদেব সিংহ। সুবোধ বাবু শরৎ প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে সরস ভাবে ও মনোজ্ঞ করে শরৎ সাহিত্য পাঠে তাঁর অনুভূতি ও সাহিত্যিক মত ব্যক্ত করেন। শেষে অধ্যাপকপ্রধান জনার্দ্দণ বাবুও শরৎপ্রতিভা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মতের প্রচলন আছে যুক্তির দ্বারা তার নিরসন করে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেন তাঁর সরস বাক্ ভঙ্গিমার সাহায্যে।

সম্পাদক পদ থেকে যে ভাবে আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপকদের কাছ থেকে সহানুভূতি ও স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি তা জীবনপথের পাথেয় হোয়ে রইলো। আর আমার সতীর্থ ও পরবর্ত্তীদের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি—আজ বিদায়ের পূর্বক্ষণে তা স্মরণ কছি। আর সঙ্গে সঙ্গে এও আশা করছি যে আমার পরবর্ত্তী সম্পাদক আমাদের অকৃতকার্য্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক।

দর্শন পাঠ-গোষ্ঠী :

অকস্মাৎ এ বছর দর্শন পাঠ-গোষ্ঠী বিস্ময়কর কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সভা বা বৈঠক হয়েছে ১৩টা—প্রতি বৈঠকে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

অধ্যাপকবৃন্দও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আমাদের ক্রমাগত উৎসাহিত করেছেন। শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য 'হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি' এই বিষয়ের ওপর নিজে অভিভাষণ দিয়েছেন দুদিন। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার প্রতি

সভায় উপস্থিত থেকে অন্তর্নিহিত ছাত্র-সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। আর পাঠ-গোষ্ঠীর সভাপতি ডাঃ সরোজকুমার দাশের কথা বলাই বাহুল্য। পাঠ-গোষ্ঠীতে পুস্তক-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৯৫ থেকে ১২৩-এ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়েছে :—

Science and Philosophy	Sreela Mahalanabis
Personality of God	Ramesh Chandra Gupta
Religion and Morality	Pratima Sen
Types of Idealism	Ila Moulik
Science and Religion	Savita Maitra
Behaviourism	Amal Banerjee.
God and the Absolute	Kshama Ganguly.
Space and Time	Sachindra Gangopadhyaya.

শ্রীশচীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীরমেন গুপ্ত
—যুগ্ম-সম্পাদক, দর্শন পাঠ-গোষ্ঠী।

ইতিহাস সেমিনার :

পুজোর আগে ছবার আমরা মিলিত হয়েছি। প্রথম অধিবেশনটিতে ডক্টর চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত ইতিহাস কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে তিনি যা দেখেছেন শুনেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলেন। এর পরের অধিবেশন ক'টিতে ছাত্রদের ভিতর থেকে যাঁরা স্বলিখিত প্রবন্ধ পড়েন তাঁরা যথাক্রমে শ্রীবিমল চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅংশুরঞ্জন সেন, শ্রীজগন্নাথ মিত্র, শ্রীশিবনাথ রায় এবং শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী। এঁদের বিষয় ছিলো : 'ইতিহাসের দর্শন,' 'ধর্ম আন্দোলন হিসেবে রিফর্মেশন,' 'আধুনিক ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লব,' 'প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ' ও 'বাংলার নবজাগৃতি'। প্রতিবারেই শ্রোতার সংখ্যা ছিলো অনল্প—আমাদের ছোট ঘর আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে। ছুটির পরে কলেজ খুললেই 'পৃথিবীর বিপ্লব' বিষয়ে নামী অধ্যাপকদের নিয়ে একটা Symposium-এর ইচ্ছে আছে। তখন ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরী এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীও প্রবন্ধ পাঠে প্রতিশ্রুত।

গত ফেব্রুয়ারীতে বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের এক প্রীতি সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করা হয়; প্রথাসিদ্ধ বক্তৃতা থেকে বিরতি ছিলো তার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। ছেলেদের নিয়ে মার্চ মাসে ডক্টর দাশগুপ্ত মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর যাত্রা করেন; যাদুঘরেও তিনি আমাদের বেশ কয়েকদিন ঘুরিয়ে এনেছেন।

সেমিনার লাইব্রেরীতে এখন যা বই আছে সে প্রায় একশো পঁচিশের মতো। এর মধ্যে খান পনেরো নতুন আনা। ছুটি পত্রিকাও আমরা পাবো এখন থেকে; বিলেত থেকে প্রকাশিত History, আর এদেশের 'ইতিহাস'।

আমাদের সমস্ত উৎসাহের উৎস আমাদের অধ্যাপকমণ্ডলী। আশা করি সেমিনারের উজ্জ্বল ঐতিহ্য আমরা সাফল্যের সংগে বজায় রাখতে পারব।

শিবনাথ রায়—সম্পাদক, ইতিহাস সেমিনার।

সেমিনার রিপোর্ট—অর্থনীতি :

সেমিনার লাইব্রেরীর পুস্তক-স্বল্পতা দূরীকরণের গুরু দায়িত্ব নিতে হ'ল আমাকেই, যদিও গ্রন্থ-দৈন্য বিভাগীয় পাঠাগারের আজন্ম সমস্যা। এই দায়িত্বসাধনে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের আন্তরিক সহযোগিতা

একান্তভাবে স্মরণীয়। আমাদের যৌথ উদ্যমে, সাধারণ পাঠাগার থেকে কতকগুলো সত্যিকারের প্রয়োজনীয় বই এই বিভাগে স্থানান্তরিত হ'য়েছে।

এবার সেমিনারের প্রথম অধিবেশন বসে প্রহ্লাদ বসুর 'Food Problem in India' নিয়ে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। অর্থনীতি-অতিরিক্ত ছাত্রদের উৎসাহ-উৎসুক উপস্থিতি এবং আলোচনা-প্রত্যালোচনায় যোগদান সভাটিকে মনোরম ক'রে তোলে। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Economic Planning in India' (দ্বিতীয় অধিবেশন) ভারতকে অর্থনীতির নতুন পরিকল্পনার কথা শোনায়। 'Industrial Finance' এবং 'Foreign Capital—its implications in India' শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ লেখা হয়ে আছে। শীগগিরই পড়া হবে।

তাদের সহযোগিতার জন্য বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীগণকে পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ ক'রে দ্বিজেন দে, অনিল ঘোষ আর মাধবী মুখার্জিকে।

বটকৃষ্ণ দে—সম্পাদক, অর্থনীতি পাঠ-গোষ্ঠী।

রাজনীতি পাঠ-গোষ্ঠী :

আত্যান্তিক দুঃখের সংগে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রবন্ধ পাঠ বিষয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে এবারে বিশেষ সাড়া পাইনি। এবছরে মাত্র তিনবার সেমিনারের বৈঠক বসে। সর্বপ্রথম বলেন অধ্যাপক রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'Nature of the Indian Constitution' সম্বন্ধে। তারপর পড়েন শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী 'Monism vs. Pluralism' শীর্ষক প্রবন্ধটি। সব শেষে শ্রীগৌরীপদ ভট্টাচার্য্য 'Dictatorship' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই সেমিনারটি পুস্তক-স্বল্পতার জন্য নাম কিনেছে। অবশ্য দরকার মতো ১০।১১ খানা বই এবছর বাড়াতে পেরেছি। তাহলেও আমার মনে হয় কতকগুলো ছেঁড়া আর অপ্রয়োজনীয় বই নিয়ে রাজনীতি পাঠ-গোষ্ঠীর কোন পৃথক সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। একে অর্থনীতি পাঠ-গোষ্ঠীর সংগে যুক্ত করে দিলে কেমন হয়? ভবিষ্যতের আগন্তুকদের হাতে এর সমাধানের ভার রইল।

পরিশেষে অধ্যাপক-প্রধান উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় আর অধ্যাপক রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের উপদেশ দিয়ে যে সাহায্য করেছেন তার জন্যে তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ—সম্পাদক।

জিওলজীক্যাল ইনষ্টিটিউট, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা :

ভূবিদ্যা ও ভূগোলের ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী এনে দেবার এবং বিজ্ঞানের এই দুই শাখাকে ছাত্রদের কাছে আরও ঘনিষ্ঠতর ক'রে তোলার যে উদ্দেশ্য নিয়ে ৪৫ বৎসর আগে এই প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা হয়েছিল তার কতটা সফল হয়েছে জানি না, কিন্তু এ-কথা বলতে পারি যে ইনষ্টিটিউট তার কাজ যথেষ্ট বাড়িয়েছে এবং ভূবিদ্যা ও ভূগোলের প্রত্যেকটি ছাত্রের কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠেছে।

বাইরেও এই ইনষ্টিটিউটের প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট সভ্য হবার আবেদন পাচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে পত্রিকা বিনিময় দ্বারা। বর্ত্তমান কার্য্য-বৎসরে ছয়টী সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শ্রী এ, কে,

ঘোষ, রেজিষ্ট্রার, বোস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ; ডাঃ জে বি অডেন ; আলীপুর আবহাওয়া অফিসের শ্রী এম, গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরজিৎ সিংহ ; আলীপুর আবহাওয়া অফিসের ডিরেক্টর শ্রী এ, কে, রায় ; জিওলজীক্যাল সার্ভের ভূবিদ্ শ্রী জে, এন দত্ত। একটি বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন ডাঃ এফ, এইচ, খান। বিভিন্ন অধিবেশনের ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক এই বক্তৃতাগুলি যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ইনষ্টিটিউট এবার যথেষ্ট সংখ্যক Excursion-এর আয়োজন করতে পারেনি। তবে টিটাগড় পেপার মিলস্ এবং আলীপুর আবহাওয়া কেন্দ্রে Excursion-এ বহু ছাত্র যোগদান করে। চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বৎসরেও বহুসংখ্যক শিক্ষামূলক সবাক চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ভূবিদ্যা ও ভূগোলের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠচক্রের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলেছে। এই বৎসরে প্রত্যেকটি পাঠ-চক্রের যথেষ্টসংখ্যক অধিবেশন হয়েছে ; প্রত্যেকটি অধিবেশনে ছাত্ররা নিজেদের লেখা রচনা পাঠ ও আলোচনা করেছে।

বিভিন্ন চল্‌তি খবর নিয়ে আমাদের ইনষ্টিটিউট থেকে বুলেটিন বার হয়েছে দুটি সংখ্যায়, তা ছাড়া আমাদের বার্ষিকী, 'ভূবিদ্যা' বার হবে আমাদের বার্ষিক অধিবেশনে।

বর্তমান কার্য্যবৎসর শেষ হয়ে এলো। যতটুকু আমরা করতে পেরেছি, সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। আমাদের ইনষ্টিটিউটকে আরও সুন্দর করে তুলতে হবে।

শ্রীদেবব্রত ঘোষ—সম্পাদক।

ফিজিওলজীক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট :

গত বৎসরের ১৯-৮-৫০ তারিখে এই শিক্ষাসংসদটির নিয়মাবলী কিছুটা অদল-বদল করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সৃষ্টি। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান ভারতে বোধ করি এই প্রথম।

তিন জন সভ্য নিয়ে এর পরিচালক সমিতি তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে আছেন একজন সম্পাদক—শ্রীসুখময় লাহিড়ী, একজন সহ-সম্পাদক—শ্রীদেবেন্দ্র সিং, তৃতীয় জন হচ্ছেন শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি।...বর্ত্তমানে ১ম এবং ২য় বর্ষ ছাড়া ফিজিওলজির আর সব ছাত্ররা সভ্য বলে গণ্য হবেন। শিক্ষক ও গবেষক ছাত্ররাও এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য।

প্রতি সপ্তাহেই এই সংসদের একটি করে সভা হয় এবং সভায় ফিজিওলজি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এপর্য্যন্ত যারা বলবার সুযোগ পেয়েছেন :

বিষয় :

১। শ্রীসুখময় লাহিড়ী — 'Growth'
২। শ্রীদেবজিৎ বিশ্বাস — 'Blood Substitute'
৩। শ্রীদেবজ্যোতিঃ দাশ — 'Function of Ovary'
৪। শ্রীঅজিত মুখার্জ্জী — 'Dietary Requirements'
৫। শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জ্জী— 'Life and its Origin.'

সংসদের পক্ষ থেকে একটা Excursion-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই সংসদের একটি পাঠ-গোষ্ঠী আছে। ... প্রতি বৎসর December মাসে এই বিভাগীয় পুরাতন ছাত্রদের পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও ইন্‌সটিটিউটের বহুবিধ উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা আছে। এর জন্য দরকার প্রত্যেক সভ্য-সভ্যার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও স্বার্থহীন ত্যাগ।

সুখময় লাহিড়ী।

ভূ-জ্ঞান-পরিষদ :

অনেক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর প্রেসিডেন্সি কলেজে "ভূ-জ্ঞান" বিভাগ (Geography Dept.) খোলা হইয়াছে। এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই ; কাজেই এই অল্প সময়ের মধ্যে উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসজ্জিত করিয়া তোলা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ভূ-জ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকমণ্ডলীর উৎসাহ এবং আগ্রহে গত ৫ই অক্টোবর আমাদের "ভূ-জ্ঞান-পরিষদ" খোলা হইয়াছে।

একেবারে নূতন হইলেও আমাদের পরিষদের কার্য্য এখন হইতেই সুরু করা হইয়াছে। এই পরিষদের তরফ হইতে গত ৭ই অক্টোবর তারিখে Physics Lecture Theatre-এ 'The Death Valley' এবং 'T. V. A.' নামক দুইটি আলোক চিত্র প্রদর্শিত হয়। পূজার ছুটির পর পরিষদের এক সাধারণ অধিবেশনে দুইটি ভূ-জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শ্রীতড়িৎকান্তি দেব রায় [৪র্থ বর্ষ, বিজ্ঞান] এবং শ্রীসোহং ভট্টাচার্য্য [তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান] যথাক্রমে 'Tea' এবং 'Origin of the Earth' নামক দুইটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীনিশীথ রঞ্জন কর। আমাদের ভূ-জ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগার আমাদের কলেজের এক মূল্যবান সম্পদ। বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, মূল্যবান ফরাসী গ্রন্থমালা ইত্যাদি লইয়া প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত।

প্রণবকুমার গুপ্ত—যুগ্ম-সম্পাদক,
(অন্তর্বিভাগ) ভূ-জ্ঞান-পরিষদ,
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

রবীন্দ্র পরিষৎ :

এই বৎসরের প্রথম অনুষ্ঠান হিসাবে ১৬ই চৈত্র কবিগুরুর গীতিনাট্য 'নবীন' পরিবেশন করা হয় ওয়াই, এম. সি.-এর চৌরঙ্গী হলে। ২২শে শ্রাবণ আর্টস লাইব্রেরী হলে রবীন্দ্র স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীভূপতি মোহন সেন। রবীন্দ্রনাথের গান এবং সংলাপ সঙ্কলন করিয়া বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৫ই ভাদ্র ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে। পরিষদের সহযোগিতায় কলেজে বনমহোৎসব উদযাপন করা হয়। শিশুবৃক্ষ রোপন করেন অধ্যক্ষ শ্রীযতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী সংস্কৃত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন। এইসব অনুষ্ঠান আয়োজনে আমাদের কলেজের একটি নিজস্ব হলের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি।

প্রতি সপ্তাহে পাঠচক্রের নিয়মিত অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। বিভিন্ন অধিবেশনে কোন বই-এর আলোচনা অথবা স্বরচিত রচনা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীদিলীপ সেন, অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ও চিত্তপ্রিয় ঘোষ, বটকৃষ্ণ দে প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ।

সুব্রত রায়—সম্পাদক, রবীন্দ্র পরিষৎ।

সমাজ-সেবা বিভাগ :

বর্ত্তমান বৎসরে সাহায্যপ্রার্থী দুঃস্থদের কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। স্থানীয় দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য সংগঠিত সান্ধ্য বিদ্যালয়টি পুনরায় চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে তাকে বেশী দিন চালু রাখা যায় নাই। অর্থাভাব হেতু সমাজ-সেবা ও সামাজিক সমস্যাদি নিয়া মনোজ্ঞ আলোচনা ও বক্তৃতা দেওয়াইবার ও প্রতি বৎসরের ন্যায় গ্রামাঞ্চলে "Relief Tour" করার পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

কলেজের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে "চিত্রা"তে এক ছায়াচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। এই প্রসঙ্গে এম্. পি. প্রডাক্সনের শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার ও Esha Film Distributors-কে সহযোগিতার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বেদপ্রসাদ সেন—সম্পাদক, সমাজ-সেবা বিভাগ।

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান সেমিনার :

বর্ত্তমান বৎসরে পাঠাগার হইতে উপাধিপরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত কয়েকটি পুস্তক আনয়ন করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে পাঠাগারে উপযুক্ত পুস্তক আনয়ন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সাপ্তাহিক পাঠ-বৈঠক আহ্বান করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সেমিনারের প্রভূত উন্নতিসাধনে অধ্যক্ষ ডাঃ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহোদয় ও অধ্যাপক শ্রীপুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহোদয় যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

শ্রীসুভাষচন্দ্র গুহ—সহকারী পরিচালক।

ষ্টুডেণ্টস্ ভলাণ্টিয়ার কোর :

এই সংগঠনটির কর্ম্মক্ষেত্র শুধু কলেজের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ ছিল না—পূর্ব্ববঙ্গ বাস্তুহারাদের সেবার জন্য আমাদের কলেজের তরফ হইতে যে কর্ম্মপন্থা গৃহীত হয়, তাহাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব এই ছাত্রদল সক্ষমতার সহিত বহন করিয়াছে। প্রথম বৎসরেই এই সংগঠনটিকে আশানুরূপভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি নাই—যদিও ইহার কর্ম্মপন্থা একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ আর সহযোগিতার ফলে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অধিনায়ক।

নাট্য পরিষদ :

প্রতি বৎসরের মত এবারও নাট্য পরিষদের উদ্যোগে শারদীয় উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। গত ৯ই অক্টোবর এই উপলক্ষ্যে "শ্রীরঙ্গম্" রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ও জলসার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পটির নাট্যরূপ রচনা করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র জগদীন্দ্র ঘটক এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা। এই সঙ্গে একটি জলসার আয়োজন করা হয়, অংশ গ্রহণ করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশিষ্ট অভ্যাগত শিল্পী। বহু ছাত্র এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

—সম্পাদক, নাট্য পরিষদ

প্রেসিডেন্সি কলেজ রিলিফ কমিটি :

সাম্প্রদায়িকতার দরুণ দুর্যোগের মধ্যে আমাদের 'পূর্ববঙ্গ বাস্তুহারা সেবা সমিতি'র কাজ সুরু হয়। বিরাট প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সামর্থ্য অল্প জেনেই আমরা ডাঃ মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে গঠিত East Bengal Relief Committee-র সংগে একযোগে কাজ আরম্ভ করি। আমাদের ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রতিদিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে East Bengal Relief Committeeর সংগে সেবা কাজ করতে থাকেন।

বাৎসরিক 'ষ্টিমার পার্টির জন্যে নির্দিষ্ট আড়াই শ' টাকা দিয়ে আমাদের সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকদের দানে এ-ভাণ্ডারে মোট জমা হয় ৭৩৫৲ টাকা। ঐ টাকার মধ্যে ৫০১৲ টাকা East Bengal Relief Committee-কে দান করা হয় এবং বাকী টাকা আমাদের কলেজের উদ্বাস্তু ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হয়। এ ছাড়া আমরা কিছু পুরানো কাপড়ও বাস্তুহারাদের জন্যে সংগ্রহ করি।

সেবা-সমিতির কাজে সাধারণ ছাত্রদের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং সভাপতির অমূল্য উপদেশ পেয়েছি সে জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিরঞ্জীব বসু—সম্পাদক,
প্রেসিডেন্সি কলেজ রিলিফ কমিটি।

বিবরণী (প্রকাশনা বিভাগ) :

অনেক দিন পরে শেষে সত্যিই পত্রিকাটি সবার হাতে তুলে দেবার সৌভাগ্য হল। গত বছর কার্য্যভার গ্রহণের পরই আগের বছরের অপ্রকাশিত পত্রিকার প্রকাশনার কাজ হাতে নিতে হয়। সে অসমাপ্ত কাজটুকু সেরে এবার নতুন বছরে এ পত্রিকা বের করতে হল। তাই অল্প সময়ের ব্যস্ততার তাড়ায় যে ভুলচুক হয়েছে তার জন্যে আমি একান্তই দুঃখিত।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা প্রকাশনা বিভাগের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল এই যে, যে পরিমাণ অর্থ প্রকাশনা বিভাগে দেওয়া হয় তাতে বছরে একটির বেশী পত্রিকা বের করা কোনমতেই সম্ভব নয়। অথচ ছাত্রদের তরফ থেকে এর জন্যে আমরা নানা অভিযোগও শুনতে পাই। বছরে একটির বেশী পত্রিকা প্রকাশনার প্রয়োজন অবশ্যই অনস্বীকার্য্য। তাই ছাত্র সংঘকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, ম্যাগাজিন ফি বাড়িয়ে বা বিভাগীয় অর্থ বণ্টনের সময় প্রকাশনা বিভাগকে একটু উদারতা দেখিয়ে যেন অর্থের পরিমাণটা বাড়ান হয়।

পরিশেষে পত্রিকা প্রকাশনার কাজে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সহ-সমিতির সভ্যগণ এবং বাইরে থেকে অরবিন্দ কুণ্ডু, রমেশ গাঙ্গুলী, সুনীল পাইন ও অশোক মুখোপাধ্যায় তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে প্রকাশনার কাজ ত্বরান্বিত করেছেন—এজন্য তাঁদের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

প্রকাশনার কাজে কলেজের কোষাধ্যক্ষ শ্রীরমেশ চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অফিসের কাজের চাপের মধ্যেও তিনি সময় করে পত্রিকা প্রকাশনার জন্য যে-ভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন তার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সৌরীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

কোষ-রক্ষক (বিদ্যার্থি বিভাগ) Report of Junior Treasurer :

কলেজ ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের কথা বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কলেক পত্রিকার মারফৎ সাধারণ ছাত্রদের জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি।

১৯৪৯-৫০ সালের কলেজ ইউনিয়নের বাজেট ৫০' সালের ৬ই জানুয়ারী ছাত্র ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিত করা হয়। বিস্তৃত আলোচনার পর ৭ই জানুয়ারী পরিষদ্ কর্তৃক এই বাজেটটি গৃহীত হয়। এই বাজেটের বিবরণ কলেজ ইউনিয়নের মুখপত্র 'প্রকাশনী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। যে ছাত্রসংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমাদের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছিল, পরে জানা যায় ছাত্র সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী। কাজেই গত সেপ্টেম্বর মাসে এক অতিরিক্ত বাজেট ইউনিয়ন পরিষদ্ গ্রহণ করে।

১৯৪৯ সালের কলেজ ইউনিয়নের বিভিন্ন বিভাগের খরচের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হোল।

আয় :

আমাদের কলেজের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই বার্ষিক ৯৲ (নয় টাকা) হিসাবে Sessional fee দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে ৪৲ (চার টাকা) Athletic Fund এর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। বাকি ৫৲ (পাঁচ টাকা) Union Societyর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকলেও এর মধ্যে ১।৷৹ (দেড় টাকা) কলেজ পত্রিকার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। বাকি ৩।৷৹ (সাড়ে তিন টাকা) Unionএর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এ বৎসর কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১২৩৮ জন। সুতরাং আমাদের আয় :—

১২৩৮ × ৩।৷৹	...	৪৩৩৩৲ (চার হাজার তিনশ তেত্রিশ)।
১২৩৮ × ১।৷৹ (কলেজ পত্রিকা)	...	১৮৫৭৲ (আঠারশ সাতান্ন)।
	মোট	৬১৯০৲ (ছ হাজার একশ নব্বই)।

ব্যয় :

বিতর্ক	...	৩৯৯৸৹
সমাজ সেবা	...	২৯৭৷৶৹
রবীন্দ্র পরিষদ্	...	৭৭৯/১০
নাট্য পরিষদ্	...	৯৪০।/৹
বিরাম পীঠিকা	...	৪৯৮৸৹
সাধারণ (ইউনিয়ন অফিস প্রাচীর-পত্র প্রকাশনী প্রভৃতি)	...	৫৮৭৸/৫
রি-ইউনিয়ন	...	৩৯৬/১৫
স্বেচ্ছাসেবক	...	১০৲
রিলিফ	...	২৫০৲
	মোট	৪১৬০।/১০ (চার হাজার একশ ষাট টাকা সাড়ে পাঁচ আনা)

নির্দ্দিষ্ট ১৮৫৭৲ ছাড়াও College Union কলেজ পত্রিকার জন্য ১৫০৲ অতিরিক্ত বরাদ্দ করেছে। কলেজ পত্রিকার খরচের বিবরণ এই তালিকায় ধরা হয় নি। বোম্বাই-এ N.U.S. Conference-এ আমাদের College-এর প্রতিনিধিদের খরচের জন্য ৫০৲ ইউনিয়নের Reserve Fund থেকে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বরাদ্দ অর্থের পরিবর্ত্তন অনেক সময় আমাদের করতে হয়েছে।

আমাদের বর্ত্তমান Senior Treasurer এবং কলেজের বার্সার অধ্যাপক গুরুদাস ভড় এবং ভূতপূর্ব্ব Senior Treasurer অধ্যাপক দুর্গাপদ আচার্য্যের মূল্যবান উপদেশ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁদের আমি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদকগণ এবং কলেজের কোষাধ্যক্ষ শ্রীরমেশ চন্দ্র নন্দীর সহায়তার কথার উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমল কুমার সেন—জুনিয়র ট্রেজারার

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

The Far East and World Peace

TO-DAY the Far East looms large in world politics. Ever since the U.N. ordered their forces to march to Korea, the whole world is in the grip of terror—the terror of a world-wide conflagration. Everyone wants to avert the danger, no one wants war, yet everybody fears that war is nearer to-day than before. This is the tragedy of the whole situation.

The democratic forces of the world which joined hands in the face of a common danger are sharply divided to-day, 'The people of the United Nations', who assembled with pious wishes at San-Francisco are no more united. Their war-time co-operation has yielded place to distrust and suspicion. The clash of material interests that had in ages past ignominiously interred many pious wishes is raising its head.

It is a commonplace of history that every big conflict brings after it an intense desire for peace all over the world. The aftermath of a great war is therefore marked by attempts at building up a united world based on co-operation and sympathy. This was so with the Grand Design of Henry IV, the project of the Spanish Saint Pere, with the project of the great German philosopher Kant. It is so in recent times—in the Concert of Europe and the League of Nations, and the U.N. is the latest of such attempts.

When the immediate danger is averted, peace reigns for a time, people breathe more freely ; but evil designs peep in men's minds. These designs are, however, an expression of their self-interest, a realisation of 'necessity', of their 'dues' which have been unjustly taken away by others. So their self-seeking becomes more prominent than their desire for peace. Sympathy and co-operation recede on into the background, suspicion and hatred raise their heads. The prospects of peace become remote, people desire peace but they 'drift' into war.

The same picture we get to-day. All over the world people want peace. But with the talks of peace preparations for war go on. Military expenses are increasing, conscription is practised, new bombs are manufactured, all the great powers want to keep the powder dry.

When we come closer we find that there is an inherent contradiction in the attitude of the great powers on whom depends the peace of the world. While the United States talks of peace and democracy, her dollars flood the States of Western Europe, her soldiers batter down the walls of Korea, her generals put Japanese nationals to death. To put down a civil war she kills more than would have been killed in the civil war itself. Korean peace may be a necessity for world peace, but to establish peace on the ashes of Korea, to teach democracy to the Korean corpses is really ironical justice. Militant nationalism in Japan might have been a threat to world peace at one time but to check that nationalism it is hardly necessary to reduce the Japanese to abject servitude. Communism may be a threat to democracy but it is needless to emphasise that a people has the right to be governed as it likes. To bolstar up the brigands of Chiang Kai-Shek in order to check up Chinese Communism, be it bad, is indeed a curious method of democracy.

This is only one side of the picture. We must not be carried away by professions of the other camp and think that there is a strong desire for co-operation there. While Soviet Russia emphasises more than once that Communist and Capitalist countries can live together, her actions in no way conform to her words. She talks of peace and co-operation in the United Nations but gives moral, if not material, encouragement to Korean Communists. The prospects of a peaceful solution thus become darker. Her action on the Chinese issue may be correct. But on various other issues her attitude is more open to controversy. Different and at times fantastic speculations are prevalent about her armed might and military equipment. Russia does nothing to allay these suspicions, rather her so-called 'iron curtain' adds to these suspicions. Not infrequently do we read in newspapers that Russia can destroy in a day the whole of Western Europe.

It can hardly be denied that the moral strength of the U.N. is decreasing daily. An international organisation where more than 40 crores of people remain unrepresented, where the largest European country fails, whatever may be the reason, to co-operate with the other great powers, can hardly be expected to maintain world peace. It is needless to emphasise that war cannot end war and an 'international police' running throughout the globe is sure to fail, as it had failed in times past, to keep the peace of the world. Faith, co-operation and good-will are pre-requisites of peace and no amount of police action or military armament can maintain peace if these are absent.

The destiny of our country is so much linked up with the destinies of her great neighbours that she cannot overlook the recent developments in the Far East. It will, however, be too early to make any prediction about the future of the Far East. Events are taking place in quick succession, too quick to warrant any speculation. A new chapter of history is being written in the Pacific. It is for us to follow the course of events, not to make a too early prediction. But we must hope for the best.

Although materially a weak power, India has a voice in Far Eastern affairs which cannot be easily disregarded. Her influence may be of some help to the peace-loving peoples in Asia. India and China have been the traditional fields of exploitation and land-grabbing of the 'democratic' powers to-day. The resurgence of these two countries has brought a new ray of hope to millions of distressed Asians. In the unity of these two countries lies the emancipation of the Asian people. Let us hope that these two countries, the seats of ancient civilisation, will act together and their unity will mark the end of the diehard colonialism of the Western powers and inaugurate an era of peace, freedom and progress for the people of the Far East.

George Bernard Shaw

Death has taken a great toll. Bernard Shaw is no more. The true estimate of his greatness is impossible until the surging sea of grief has subsided and time has sieved out all that is ephemeral about him. Nor is any such attempt made in this short space.

The world to-day is full of base conflict. The very foundation of human civilisation has been rendered fluid. The value of human life has touched a minimum. At this critical stage we can ill afford to lose the prophet who preached with the belief that moves the mountain the seemingly impossible doctrine of eternal life. He dreamt of life freed from matter and hence from all base conflicts that arise from lust of matter. He had the vision of life as a vortex of pure intelligence and force marching victoriously till it has filled the universe to its uttermost confines. Whether this vision is an empty dream is debatable, though like all other ultimate truths about life never likely to be settled by debate. With a heavy heart we mourn the loss of one who gave us this vision which acts like a healing balm of Man growing into Superman.

Sardar Vallabbhai Patel

The death of Sardar Vallabbhai Patel has come to us as a shock. The great leader, the 'Iron Man' is no more. At last, he has joined his master in the realm of eternal calm.

We are too near his time to make a correct estimate of the deeds of this great leader. Nor should we attempt that, until time has healed the wound that sorrow creates. Many will dispute the wisdom of his methods and his policy, but none will dispute the greatness of this leader.

He was born in an age when India was lying prostrate at the feet of her foreign conqueror. The woes of his mother-country shocked him and among those who, at that early age, fought for 'Swaraj' under the Great Mahatma, was this famous Sardar of Bardoli. He attained his goal, but did not live long to enjoy the fruits of victory.

At a time, when the world is full of conflict, the death of this great leader creates a void in the country's leadership, which it will be hard, if not impossible, to fill. This 'Iron Man' was ruthless at times, but he was sincere and resolute and the country needed his service at this critical period. He believed that 'law precedes liberty' and worked accordingly to establish law and order in this faction-disturbed country. His death is an irreparable loss to all peace-loving Indians.

With a heavy heart, we mourn his loss and pray for his soul peace in the realm from where no traveller returneth!

ACHARYA JADUNATH SARKAR

It is a welcome news that the Bangiya Itihas Parisad took the lead in celebrating the 81st birthday of Acharya Jadunath Sarkar. Born in 1870 Acharya Jadunath is one of the very few who have enriched Indian culture. He was born to catch the last rays of the nineteenth century Renaissance in Bengal and carry its tradition into the twentieth.

As a historian Acharya Jadunath needs no introduction. His works have been studied and applauded not only by his own countymen but by foreign scholars. He took out of the hands of Europeans the great task of reconstructing the history of India. Not only did he explore the vast field of Mogul history, but by numerous articles and essays he popularised historical research. It was Jadunath who inspired us to read our own history. As a historian he stands unique amongst Indians, and deserves to be ranked with the greatest historians of the world. Great as a scholar, Acharya Jadunath has founded a school of scientific historians which dominates to-day all historical thinking in this country.

We, as students of the Presidency College, may well feel proud that he was like us a student of this ancient institution. At the same time we cannot but feel sorry that this eminent son of Bengal has not been honoured by our University, nor by the West Bengal Government.

We, who have the fortune to enter the portals of this ancient institution, feel pride in associating ourselves with the felicitations that have been offered to one of its oldest and most distinguished alumni.

George Bernard Shaw

PROF. A. BHATTACHARYYA M.A.

THE most famous and popular dramatist of modern times was also the most isolated. Shaw complained that all his plays were misunderstood ; and this was true. It was never the practice with his critics to take his utterances seriously, or try and understand what they might mean when they sounded too paradoxical.

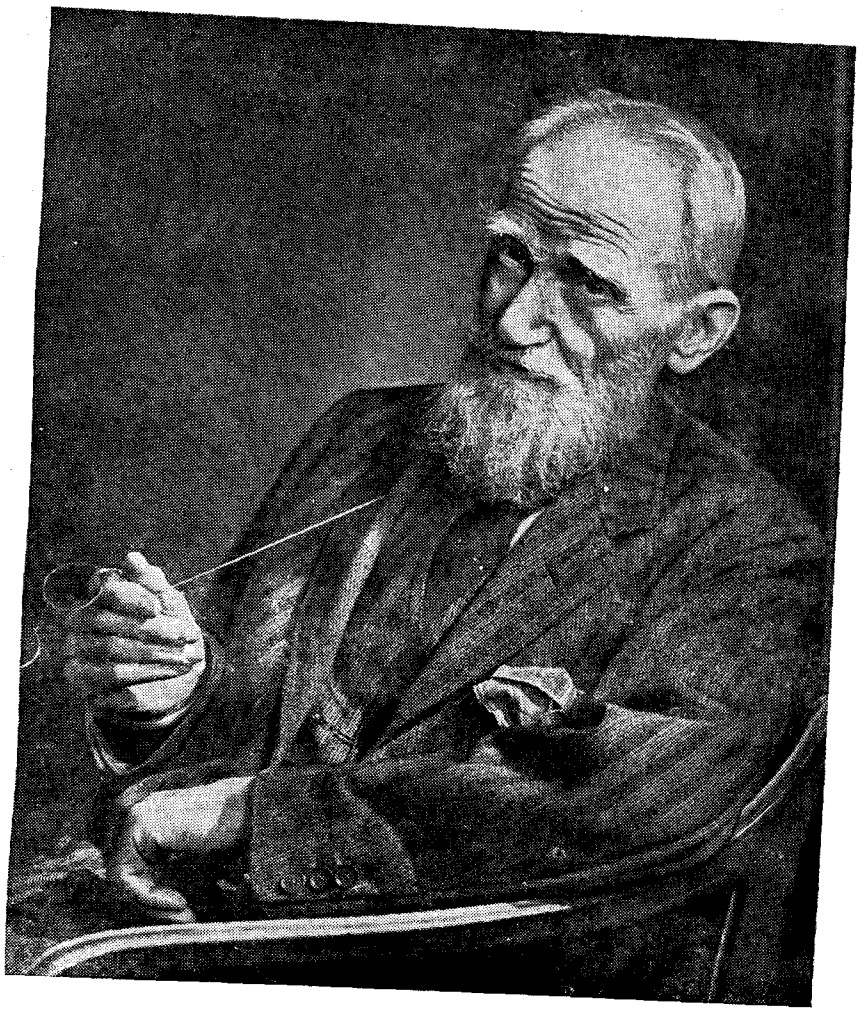

GEORGE BERNARD SHAW

By courtesy of All India Radio]

SREE AUROBINDO

By courtesy of "Satyayuga"]

The purpose and meaning of Shaw's work become much clearer if we understand what he really meant when he said, as he often did, that all great art and literature are propaganda. Art, to Shaw, was the social conscience made articulate. Like everyone else the artist must socially justify his existence, play a socially useful and vital part. Art's function, as Shaw saw it, was to clear away illusions and false values and attitudes, to bring a sense of sounder values. And in this he went back to an immemorial tradition, a tradition that had been destroyed by the growing commercialisation of art on the one side, by the spread of anarchic individualism on the other.

Shaw rescued English drama from this decadence, gave it a new moral vitality. The usual charges against him—that his plays deal with purely topical problems, that his characters have no human quality, no passion, but are simply his eccentric ideas given human names—would apply to any serious dramatist. The tragedy of Shaw's isolation is really the tragedy of contemporary culture, of contemporary society, so divided and so obsessed with the illusion of individualism that the very conception of an art inspired by a serious social purpose, dealing with what is socially valuable, has become impossible. And in protest against art's vulgarisation into a commodity, many insist today that art is only the self-expression of the individual, opposed to society. Because, to them, the only way in which art can relate itself to society is by turning itself into a commodity. The dissociation of the artist from society, the negation of an organic connection between the artist and his fellowmen, results necessarily in the frustration, the paralysis, of that very individuality which the artist seeks to propagate, and then strange theories of aesthetics are fabricated according to which this frustration itself is desirable. And this has been the path from the Romantics to the Pre-Raphaelites and Aesthetes, to Eliot and Joyce, to the Existentialists and Apocalyptics of today. Shaw never trod this path.

He set himself the task of understanding the material world, concrete social men and women, concrete and objective problems. The process was long and, perhaps, never complete. But during it he rid himself of most of the superstitions and illusions of which British artists and citizens are victims, and his work shows an astonishing development in maturity and clarity of vision and in form. It forms a pattern, product of a steady and intrinsic evolution ; his sensibility is capable of assimilating vast and diverse experience, of the most subtle and radical adjustment without altering its own nature.

This quality of the sensibility he shares with Shakspere, and the claim he often made to Shaksperean eminence is fully accurate. Shaw was naturally irritated by the deadening idolatry of Shakespere in his time, which was barring the advance of English drama. Shaw showed that the important thing was to approach life and art as Shakspere did, and he permeated the drama

with the same sense of social responsibility, gave it the same broad social foundation, that we see in Shakspere. Like him he revalues and rejects all accepted values and attitudes with a terrible logic ; and his irony has been as misunderstood as Shakspere's.

In plot, language and character Shaw returns to the external simplicity and complexity of content that we find in traditional drama, in Aristophanes, in the Miracles and Moralities, in Shakspere and Jonson. There is an immense richness. The story is always exciting, spiced with melodrama and horseplay and complicated surprises. The characters, it is true, are unlike the Romantic versions of Shakspere's characters ; they seem to have an inadequate life, to be artificially motivated. But this impression is the result of a wrong approach. Correctly, Shaw is not interested in character representation as such but as far as the character symbolises particular values and attitudes. All Shaw's important characters have just enough likeness to actual human beings to make them interesting ; but after that we must understand them allegorically. Shaw's plays follow Dante's formula in having layers of significance, and the final, most important layer is allegorical. If we remember this, the Prefaces will no longer seem to be a dispensable appendage but a part of the structure of the plays, like the Parabasis in Aristophanes' comedy.

Nothing better shows the attenuation of the general sensibility than the failure to respond to the many-sided richness and seriousness of Shaw's plays, their depth and intricacy of meaning. They demand a " multi-conscious " response, an intellectual and emotional alertness, an aptness of adjustment which existed widely once but which have been completely destroyed by current social and cultural conditions. To the average reader or spectator of Shaw's plays this is perhaps the most intractable paradox: that, in going back to the past for his most vital inspiration Shaw actually puts himself far ahead of the contemporary sensibility, bases himself on a kind of consciousness which not contemporary being but only that future being of which he dreams can generate. Thus this man, who reflects contemporary reality more completely than any other, really lives in the future.

A Glimpse into Education in Bengal in the beginning of the Nineteenth Century

PROF. BHUPESH CHANDRA MUKHERJEE, M.A.

WILLIAM Adam, an English Missionary who came to India in 1816 and who subsequently became the editor of the *India Gazette,* was appointed by Lord William Bentinck as Commissioner to enquire into the state of Vernacular Education in Bengal. Adam's Reports (1835—38) afford valuable statistics on the intellectual condition of the masses of Bengal in the beginning of the 19th century. He calculated that there were about 100,000 vernacular schools in the different districts of Bengal and Behar ; but he was shocked at the appalling ignorance of the teachers and the taught.* The education that was imparted through these schools was utterly inadequate, and incapable of improving the social and moral standard of the students. Adam calculates that, including every variety of schools—Government, Missionary and indigenous—there were, before 1835, about three persons in every hundred under education in the richest and most populous parts of Bengal, and that in India, there was only one person under vernacular education in four-hundred.† The teachers' pay and emoluments were ridiculously meagre, and one of the greatest handicaps of instruction was the paucity of juvenile text-books. It is interesting to read Adam's observations on the stereotyped and frivolous curriculum: "The arithmetical rules of *Subhankar* were employed in 32 schools. The *Guru Dakshina,* another doggerel composition which is sung by the elder boys of a school from house to house to elicit donations for their master, was taught in three schools. . . . In five schools the *Sishu Bodh* was employed, a modern compilation in print, containing *Subhankar, Chanakya* and *Guru Dakshina.* . . . One teacher I found in possession of *Man Bhanjan* and *Kalanka Bhanjan.* . . . Another teacher had the following printed works, *viz, Hitopadesh, Nitikatha, Jyotish Bibaran...and Digdarsan.*"‡ Senior students, *i.e.* learners of the fourth or the last stage often read the *Ramayana,* the *Mahabharata,* the *Manasa Mangal, the Chaitanya Charanamrita, Vidyasundar* and other books of the

---

* *Adam's Reports,* p. 19-20. He writes "...the scholars are entirely without instruction,.....there is no text or school-book used containing liberal knowledge..... so that education tends rather to narrow the mind than to improve the heart and enlarge the understanding."

† In contemporary England, the figure of literacy was approximately one in every eight men.

‡ *Adam's Reports,* Sec. V, p. 163.

same standard, some of which were by no means suitable as juvenile text-books. Again, there were social restrictions on the scope of instruction. The Kalu, Sunri, Dhoba, Mala and Chandal castes were ordinarily excluded from the benefits of instruction in letters.* Similarly, prejudice against female education was very strong, and even a beginning to communicate instruction to the extensive female population of Bengal had scarcely been made.

One peculiar feature in those vernacular schools—that of punishments inflicted on the pupils—should not be allowed to escape notice. Reverend J. Long has quoted fifteen different kinds of punishments used.† The more typical ones will, perhaps, interest the modern youth: "A boy is made to hang a few minutes, with his head downwards, from the branch of a neighbouring tree."..... "The boy is put up in a sack along with some nettles, or a cat, or some other noisome creature, and then rolled along the ground"....."the boys, when both have given offence, are made to knock their heads several times against each other," and so on. Long records the extravagant uses of the cane by the teachers, the various tricks played upon the teachers by the pupils, and the cunning plans of the boys for escaping from school.

Such were the vernacular schools and the education they afforded to the children of Bengal. No wonder Adam concludes his reports with the following rejoinder "I am not acquainted with any facts which permit me to suppose that, in any other country subject to an enlightened government, and brought into direct and immediate contact with European civilization, in an equal population, there is an equal amount of ignorance with that which has been shown to exist" [in Bengal]‡. But Adam's idea was not to supersede these institutions, but to supplement them by raising their standard, and making them instruments of imparting English education. He dwells on the importance not only of Vernacular, but also of Oriental education, and at the same time, suggests a *modus vivendi*—that of clothing English ideas and thoughts in an oriental garb conducive to the spread of education among the Indians. His constructive recommendations, however, were not accepted by the Company's Government ; his reports were shelved and the chaos was allowed to continue. But here the unexpected happened. What the government neglected was redeemed by private enterprise and initiative. A number of English Missionaries and Bengalee reformers rose to the occasion, and it is to the noble efforts and singular devotion of these pioneers that the beginnings of organized education in Bengal must be traced. The labours of Willian Carey, David Hare and Alexander Duff at Calcutta, of Ellerton at Malda, of May, Pearson and Harley at Chinsura, of Dr. Marshman at Serampore—to mention only a few of them—were mainly responsible for

---

* *Ibid.*, p. 164.
† Introduction to *Adam's Reports*, p. 10.
‡ *Adam's Reports*, Sec. vi, p. 137.

systematizing and humanizing vernacular education of Bengal, and also for introducing western education and culture to the Bengalee youths.

The end of the 18th and the beginning of the 19th centuries witnessed the Indian society being engulfed by political eclipse, social immobility, and intellectual stagnation. Could India survive this challenge of decadence, presaging the arrest of her glorious civilization? The response to this challenge came not so much from the Indians themselves as from some of the Englishmen then living in Bengal and other parts of India. Their response to the Indian conditions was visible not merely through the media of political conquests and administrative arrangements, but also in the foundation of schools and colleges on the western model, composition and publication of suitable text-books, and dissemination of the seeds of western culture among the Indians. If the development of a civilization is the product of fighting response to a challenge*, the English Missionaries, then, responded in a more constructive manner than did the English soldiers and statesmen. The *tour de force* of this English response was the introduction and diffusion of English education by the Missionaries, thereby transforming the conventional life of the Bengalees by striking at the roots of their conservatism. The influence of the impact of the western and Indian cultures can be immediately noticed in the attempts to reform religion and social customs, and in the creation of a new Bengali literature.

At the beginning, however, the East India Company did not earnestly strive for, or contribute to the extension of English and Vernacular education in Bengal. The pioneers in this respect were certain non-official English gentlemen, several English Missionaries, and some well-placed Indians. But their desire was not easily gratified. The early attempts were not only difficult, but also hazardous. Conservative opinion at once rallied to militate against the introduction of foreign ideas, and innovators were loaded with persecutions for playing second fiddle to the British masters. The *Samachar Chandrika* a conservative newspaper first published in 1822, fought the battle-royal against the spread of English education and ideas, and placed all possible impediments to the attempts of the Missionaries to popularise the English language. The *Samachar Darpan,* an Anglo-Bengali newspaper edited in 1818 from Serampore by Dr. Marshman, with the object of disseminating the religious, social and literary ideas of the west, and of reforming the Bengali Vernacular language, published letters from many conservative Bengalee correspondents ; and these letters reveal the bitter hatred of contemporary Bengal for the outlandish ways of life introduced by the Englishmen.† The field, like the feeling, was equally discouraging. Till the end of the 18th century no Bengalee seems to have made the English language the subject of serious study. Only a superficial acquaintance with that language was obtained by the traders of Bengal who came in contact with the foreigners.

* A. Toynbee's theory, being the basis of *Study of History.*
† *Samachar Darpan,* Sept., 15, 1821 ; January, 22, 1825 etc.

The opening of the 19th century is a landmark in the history of Bengal. Fifty years of English rule had gradually familiarized the Bengalees with the religious and social ideas of the west. The establishment of the Supreme Court in Calcutta in 1774 gave an impetus to the desire for learning the English language. The foundation of the Calcutta Madrasa in 1782 is perhaps another significant factor. The general transformation, however, was heralded more by three events: (*a*) The inauguration in 1815 by Raja Ram Mohan Roy of his socio-religious movement. (*b*) The starting of a number of newspapers, both English and Bengali, by some Missionaries and Bengalees during this epoch*. (*c*) The foundation by the Missionaries of a number of Anglo-Bengali schools and colleges of which the most conspicuous was the Hindu College (subsequently the Presidency College, Calcutta). The movement for female education synchronized with this general awakening. One landlord, Raja Baidyanath Roy, donated a sum of Rs. 20,000 for the education of women†. Dr. Carey states that in 1823, one Miss Cooke, had under her care fifteen Girls' Primary Schools, teaching about 300 girls.‡ The Company's government at last formed the Department of Public Instruction in 1823, and began to take active interest in the educational activities of the people.

The work of the Missionaries and of some Bengalee intellectuals may be examined in order to estimate the progress made by the Bengalees in different branches of study through English and the Vernacular languages. Under the management of Sir E. Hyde East, J. W. Harrington, Dr. Carey, Radhakanta Deb, Tarini Charan Mitra and others, the *Calcutta School Book Society* was started in 1817 with the object of publishing suitable text-books in English and the Vernacular, and supplying them gratuitously among the students. At the instance of Mr. Harrington, and under the management of Dr. Carey, David Hare, Rasomoy Datta and others, the *Calcutta School Society* was inaugurated with the following objects: (*a*) to assist and improve the existing schools with a view to the more general diffusion of knowledge, and (*b*) to arrange for higher teaching facilities of meritorious boys by the establishment of institutions competent to conduct advanced teaching§. The Hindu College‖ was opened on Monday, January 20, 1817, at Gorachand Basak's house at Goranhatta. It was subsequently removed to Roop Charan Roy's house at Chitpore, and thence to Feringhi Kamal Bose's house at Jorasanko. The College was to include a school (*Pathsala*) and an Academy (*Maha-Pathsala*).

---

* The more important newspapers are the following: *The India Gazette; The Calcutta Christian Observer, The Samachar Darpan, The Friend of India, The Engineer, The Gyananeshan, The Athenaeum, The Parthenon etc.*

† *Samachar Darpan*, Jan. 7, 1826.

‡ *India Gazette*, Feb. 28, 1823, quoted in *Samachar Darpan*, March 8, 1826.

§ David Hare by Peary Chand Mitra, Chap. II, p. 47.

‖ David Hare, Raja Ram Mohan Ray and other friends considered the necessity of establishing a society calculated to subvert idolatry, and the feasibility of a liberal English-teaching institution was considered in 1816. But the College was actually started in 1817 by Babu Buddhinath Mukherjee with the help of Justice Sir Hyde East.

The school was to teach English, Bengali, Grammar and Arithmetic, and the Academy or College History, Geography, Chronology, Astronomy, Mathematics, Chemistry and other sciences, the first place being assigned to English.* Besides, the College also went into partnership with the School Society by agreeing to admit thirty boys annually from the various schools under the Society. Other Colleges which started during this period, were the Serampore College (only a *tol* to start with), the Lord Bishop's College in Calcutta, the Sanskrit College in Calcutta†, and the Hooghly College‡. The names of the Sanskrit and the Hindu Colleges become pleasant in retrospect when their contribution to the education of Bengal in the first quarter of the 19th century is recalled. The desire to start a Sanskrit College in Bengal by Government was opposed by Raja Ram Mohan Roy, who wrote a bold letter to the Governor-General, Lord Amherst, maintaining that resurgent Bengal needed English and Science-teaching institutions, similar in character to western schools, and not oriental institutions to revive the study of dead languages. "If it had been intended", he wrote "to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness....."§ The College was founded in spite of the opposition of the progressivists, but its course of study included the teaching of the English language and the Medical science|| in addition to the specialized study of Sanskrit. Conservative newspapers like the *Samachar Chandrika* were not in favour of such an unorthodox curriculum, and their persistent campaign led to the abolition of the English Classes at the Sanskrit College in 1835. The Medical Department was also abolished with the foundation in 1835 of the Medical College.

The Hindu College, in fact, was founded for the purpose of supplying the growing demand for English education. Some of the best Missionaries were appointed to teach the students. David Hare, the gifted Henry Derozio, and many others were there to introduce to the Bengalee youths the historical works of Hume, Robertson and Gibbon, the economic works of Adam Smith and Jeremy Bentham, the philosophical writings of Locke, Reid and Stewart, and the poetry of Shakespeare, Milton, Dryden, Pope and Burns. The prize-giving ceremonies of the college were very attractive, and were largely

---

* David Hare by Peary Chand Mitra—Appendix A.

† An editorial notice of the intention of Government to establish this College appears in *Samachar Darpan* of April 3, 1822. The College was officially founded on Feb., 25, 1824, though it actually started teaching work on Jan., 1, 1824—*Samachar Darpan*, Jan. 10, 1824.

‡ Founded in 1936. *Samachar Darpan* of Nov., 1938 mentions that this College had then 700 students, reading English, Bengali and Persian—a remarkable record indeed.

§ The entire letter quoted in "David Hare" by Peary Chand Mitra.

|| *Samachar Darpan*, May 5, 1830. Medicine was studied also at the Calcutta Madrasa.

attended by Europeans and Indians. Recitations were held and Shakespeare's dramas were successfully staged. *The Samachar Darpan** publishes that the *Merchant of Venice* was staged with the following cast:

Shylock—Kailash Chandra Datta
Tubal—Ramgopal Ghosh
Salarius—Bhuban Mohan Mitra,

and editorially comments that Kailash Chandra Datta, in the role of Shylock, gave a brilliant exhibition of his talents. Another issue of the same newspaper has reference to the staging of Henry VI in which Madhusudan Datta appeared in the role of Gloucester†. This was the future Michael Madhusudan of Bengal, who was then a boy of thirteen, and a student of the Hindu College. The part played by this college in the dissemination of English and western knowledge, was indeed, remarkable.

The annual reports of the Calcutta School Society between 1821 and 1825 furnish a refreshing picture of the labours of Carey, Alexander Duff and David Hare for the expansion of privately sponsored schools in Bengal, and extol the rapid transformation of vernacular education, the progress of English education and the promotion of female education in Calcutta and around. The Calcutta Juvenile Society was inaugurated in 1820 mainly for the support of female education. Miss Cooke, afterwards Mrs. Wilson, was the most conspicuous worker in this field. The Ladies' Society for female education was formed in 1824, and the Central School for Indian girls was opened in May, 1826, Raja Buddhinath contributing Rs. 20,000‡. The *School Society* and the *School Book Society* were like twin brothers, working in concert, and helping each other in educating Indian boys and girls. The *Samachar Darpan* gives a catalogue of the Anglo-Vernacular Schools in Calcutta before 1834, and also records the number of pupils taught in each of them§. The importance of the information is that some of these schools have survived till this day.

The introduction of English education in Bengal in the beginning of the last century produced a social revolution, and evoked a sharp reaction in the orthodox section of her population. This section saw with growing alarm the spread of atheism and irreligion among the Bengalee youths due

---

* *Samachar Darpan*, Feb. 19, 1831.
† *Ibid.*, March, 1834.
‡ David Hare—Peary Chand Mitra, p. 56.
§ *Samachar Darpan* of July 12, 1834, has the following list:

(*a*) Various Schools under the School Society.—300 Students, including the Hare School.

(*b*) Duff's School	... 350	Students
(c) Church Missionary	... 200	,,
(*d*) Oriental Seminary	... 200	,,
(e) Union School	... 120	,,
(*f*) Juvenile School	... 70	,,
(*g*) Hindu Free School	... 160	,,
(*h*) Benevolent School	... 90	,,
(*i*) New Hindu School	... 40	,,

to the purely secular education they were receiving. The wildness of their views, the growing scepticism among them, the infidel character of their opinions, their passion for aping western ways, and their spirit of recklessness horrified a large section of Indians as well as conservative Englishmen then living in Calcutta. The newspapers of the time fully ventilated the conservative reaction to this alleged mockery of western life in Bengal. The *Samachar Darpan* of September 15, 1821, has the following—

বিদ্যা গোটাকতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিনশত শিখেন—নোটের নাম লোট, লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব—এই প্রকার ইংরাজী শিখিয়া সর্ব্বদাই গোটে হেল, ডোন কের [Go to hell, do'nt care] ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গালা ভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না—সকলকেই ইংরেজী চিঠি লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বোঝেন, কোন বিদ্বান বাঙ্গালি কিংবা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠি বুঝিতে পারেন।

The father of a student reading in the Hindu College publishes a letter in *the Samachar Chandrika* describing the moral degeneration of his son."*

আমি নির্ধন মনুষ্য। পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন ২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত···কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বীপরিত রীতি হইতে লাগিল। পরে (Sic) দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক...প্রাপ্ত মাত্রই ভোজন করে—শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান—জাতীর বিষয় উপদেশ কথা হইলে Nonsence (Sic) কহে···*"।

The *Sambad Prabhakar* publishes a father's lament on his son's (a student of the Hindu College) moral decline. The aggrieved father went to Kalighat with his son where.....†

"উক্ত সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না...কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল—যথা গুড মার্ণিং ম্যডম্—ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিলেন...তাহাতে ঐ বালকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি করে, তোরে হিন্দু কলেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্য আমার জাতি মান সমুদায় গেল···"

At the same time, there were ardent sponsors of western education, and they were vigorously denouncing oriental education as being totally useless and out of date. These Orientalists and Anglicists who had English supporters to espouse their respective views, started some sort of a ' Kulturkampf ' at the end of the first quarter of the 19th century. The Orientalists had advocates like H. Shakespeare, J. Prinsep, W. H. Macnaughten and Sutherland. The Anglicists included Messrs. Bird, Saunders, Charles Trevelyan, J. R. Colvin

---

* *Samachar Chandrika*, Nov. 6, 1830.
† *Samachar Prabhakar*, May 4, 1831.

and the young reformers of Bengal. The Governor-General placed the technical recommendations of the Orientalists before the Law Member of India, Thomas Babington Macaulay, in 1835, for legal opinion. The famous Macaulay Minute of Feb., 2 1835, put a brake on all technical frivolities, and decided in favour of the Anglicists. Lord William Bentinck adopted Macaulay's views and recorded the famous Resolution of March 7, 1835 with the following memorable words: "……that the great object of the British government ought to be the promotion of European literature and science amongst the natives of India, and that all the funds appropriated for the purposes of education would be best employed on English education alone."

The relative values of the English and Oriental systems of education were thus determined *a priori* by the Governor-General. The system, as it worked out in Bengal, gave a fillip to the spread of English education among the middle class population. The education of the masses through vernacular schools was, however, sadly neglected, and the percentage of mass literacy remained as dismal as before. But the impetus officially and privately given to the introduction of English education in Bengal was responsible, within the next fifty years, for a remarkable outburst of intellectual activity in India, and a radical transformation of her social habits and religious ideas. The intellectual revolt of the youth of Bengal broke down all immobility and inertia, and augured the New India of the 19th century. Bengal contributed very largely to this Renaissance of India. It is for the young people of Bengal of the present day to live up to that ideal of independent outlook of their forbears.

Wordsworth: A Re-consideration

JOGESH CHANDRA BHATTACHARYA—*Ex-student*

A WHOLE century has passed since Wordsworth's death in 1850, and it has left him secure in poetic fame. He has stood the test of time. There is much indeed in his work that repels us, much also that makes us endorse the following remarks of a critic: " Not only does he give us matter that does not matter, but so much dead weight which weighs his reputation down." But the final impression about him is that of a great English poet who has won, in the end, an appreciative audience through the sheer penetrating beauty of his poems. He has found his way to an abiding fame which centuries cannot upset.

Detractors, however, are never lacking in the case of a great artist, and our poet is no exception. Fault has been found even with his treatment of Nature. Let us take this occasion of the centenary to pay our tribute to his great memory. We shall make a humble attempt to answer the charges levelled against Wordsworth by Mr. Aldous Huxley in his famous essay "Wordsworth in the Tropics." Mr. Huxley's charges reveal a typically modern and fashionable attitude to Wordsworth. He has pointed out two principal defects in Wordsworth's adoration of Nature. "The first is that it is only possible in a country where Nature has been nearly or quite enslaved to man. The second is that it is only possible for those who are prepared to falsify their immediate intuitions of Nature."

To begin at the beginning. "To us," Mr. Huxley says, "who live beneath a temperate sky and in the age of Henry Ford, the worship of Nature comes almost naturally. It is easy to love a feeble and already conquered enemy. But an enemy with whom one is still at war, an unconquered, unconquerable, ceaselessly active enemy—no ; one does not, *one should not,* love him." Again, he goes on, "It is a pity that he (Wordsworth) never travelled beyond the boundaries of Europe. A voyage through the tropics would have cured him of his too easy and comfortable pantheism.....Nor would he have felt so certain, in the damp and stifling darkness, among the leeches and the malevolently tangled rattans, of the divinely Anglican character of that fundamental unity. Europe's *tamed* and temperate Nature confirmed Wordsworth in his philosophizings."

We have quoted profusely from Mr. Aldous Huxley just in order to state his case in full. His first objection, then, to Wordsworth's description of Nature, amounts to this that it is partial in so far as it deals only with tamed Nature, that the poet shuts his eyes completely to the actively hostile forces in it. Nay, he goes farther, and says that one should not love inimical Nature. I am afraid Mr. Huxley makes a little too much of his preconceived sense of the hostility of Nature. In this he represents the modern spirit which is disillusioned by the ruthless, cruel aspects of Nature. Nature in the tropics is hostile no doubt. "One does not, one should not love him," according to Mr. Huxley. But one does love him. The man in the tropics is in love with his own immediate surroundings. He is in love with the wildness of Nature ; its "damp, stifling darkness" fascinates him ; he is in love with the very leeches. No civilized London could supply for him the charm of the African jungles. Do not the dangers and the difficulties of the mountain or the sea captivate a sailor or a mountaineer?

But let us come to the point. Wordsworth does not deal with the tamed aspects of Nature alone. Are 'the sounding cataract, the tall rock, the mountain and the deep and gloomy wood' tamed and conquered specimens of Nature? The poet speaks of "the tumult of the tropic sky" in 'Ruth,' he refers to Nature "red in tooth and claw." We have only

to glance at the first two books of 'The Prelude' to find descriptions of Nature wild and untamed. If, then, Wordsworth generally chooses the gentle and mild aspects of Nature, he does so with full consciousness of the other side of the picture. If, again, this one-sided view of things detracts anything from his poetic merit, then, of course, he is blamable. But it does not take anything away from his achievement. If we are to insist that the hostile aspects of Nature must be presented side by side with the benign, then which of the English poets would escape condemnation? As every poet responds to Nature according to the peculiar qualities of his own temperament, the poetry of Nature also takes many different forms. We should not quarrel with a poet for his point of view if he succeeds in fulfilling his immediate business in poetry, *viz.*, to find an exact objective correlative to what he wants to express. When Wordsworth says, for example—"The sounding cataract haunted me like a passion," he has been perfectly able to transmit his passion to the line itself. The very line seems to be haunted as it were by the repetition of the same sounds over and over again. We may not ourselves adore Nature, but for the time being we throw ourselves vicariously into the Wordsworthian mood ; for it is perfectly possible to have full literary or poetic appreciation without sharing the beliefs of the poet. We must not forget that sympathetic understanding is very different from acceptance. As Prof. Mattheissen has aptly remarked: "The test that reveals Tintern Abbey as a great poem does not depend on the question of whether or not we agree with Wordsworth's views, but on the realization that these lines beat with the completely convincing note which only a rarely sincere and original rhythm can communicate, and thus persuade of the genuineness of their vision as they make us share it." We must, after all, judge a poet by what he actually gives us, and not by what he never proposed to give.

Mr. Aldous Huxley's second charge is that Wordsworth does not deal with his immediate intuitions of Nature. " Wordsworth, " he says, " wants the earth to be more than earthy, to be a divine person. But the life of vegetation is radically unlike the life of man: the earth has a mode of being that is certainly not the mode of being of a person. ' Let Nature be your teacher ', says Wordsworth.....But how strangely he himself puts it into practice!.....Instead of accepting the lesson as it is given to his immediate intuitions, he distorts it rationalistically into the likeness of a parson's sermon or a professional lecture.....In his youth, it would seem, Wordsworth left his direct intuitions of the world unwarped.....As the years passed, however, he began to interpret them in terms of a preconceived philosophy." Mr. Huxley takes the artist as a non-intellectual, non-moral, instinctive type of a man. The poet, according to him, is ' of the devil's party. ' And with this a-priori theory fixed in his mind, he starts condemning Wordsworth. Wordsworth, according to him, "used his intellect to distort his exquisitely acute and subtle intuitions of the world, to explain away their often dis-

quieting strangeness, to simplify them into a comfortable metaphysical unreality." "The poet," he exclaims, "the devil's partisan was doomed; the angels triumphed. Alas!"

Our very first objection to this criticism is that the keynote of Wordsworth's poetry of Nature is his insistence on intuition and impulse rather than on an intellectual approach. It is very strange no doubt to blame for rationalizing a poet to whom "one impulse from a vernal wood" meant more than the teachings of all the sages, a poet, moreover, who states explicitly:

> "Sweet is the lore which Nature brings;
> Our meddling intellect
> Misshapes the beauteous forms of things;
> We murder to dissect."

Then again, Mr. Huxley's sole reliance on intuition comes perilously near the Art for Art's sake theory. He speaks of a preconceived religious theory of Wordsworth. He himself, on the other hand, is obsessed with the theory of an artist as a perfectly non-intellectual and non-moral type of a man, and then he tries to fit Wordsworth into his conception. I doubt whether any great artist has ever done without the fundamental brainwork that must be there in art. Besides, Wordsworth does not come to Nature with any preconceived religious theory. There is not the slightest trace of it anywhere in his poetry. His contemplation of Nature gradually leads him on to the perception of a harmony between man and Nature. Mr. Huxley's quarrel, as we find, is mainly with this contemplative element. Should we then call upon Wordsworth to remove this element altogether from his poetry and give us instead a photographic presentation of external Nature? Mr. Huxley's hostile-nature-complex makes him object to Wordsworth's finding unity in the diversity of Nature. But the greatness of a poet or an artist lies here that he achieves a complete synthesis of conflicting forces which would simply cancel each other. He discovers an organic unity in the whole order of creation. In fact, this is the element that constitutes the greatness of Wordsworth as a poet of Nature.

The irony of the whole thing, however, is that Mr. Huxley himself, within a decade of his writing the essay in question, has discarded altogether his conception of the artist as a devil's partisan. His 'Ends and Means' and 'Eyeless in Gaza' preach quite the opposite doctrines: Here, again, is an additional point in favour of our poet.

On Philosophic Reflexion

JITENDRANATH MAHANTY, M.A.—*Ex-student*

THE speculative career of a philosopher begins with doubts and torments. But, of one thing, at least, he is expected to have a somewhat clear conception to start with ; and that, regarding the nature of the reflexion, he is going to undertake. Yet, such is his fate that even as to this basic problem, he finds himself in no comfortable position. And the further his thought advances, the more acutely does he realise that for him, to attain to that moment of supreme self-consciousness, wherein alone he can define for himself the nature of his reflexion, instead of being the starting point of his philosophic career, is rather its culmination and final fruit.

But this need not depress us. The fact is that the question regarding the nature of philosophic enquiry, is itself a philosophic problem. No other department of enquiry confronts us with such a situation. What the nature of scientific thinking is, is not a question that interests the scientist ; and if the latter evinces such an interest, he has already ceased, for that moment, to be a mere scientist. If this is true of all positive sciences, it is no less true of history. In his moment of self-consciousness, the historian rather philosophises about history ; and the corresponding problems concerning history have constituted the important branch of historical enquiry, known as the philosophy of history.

It is only in the case of philosophy, that the problem is otherwise. Any question regarding the nature of philosophic enquiry is already a philosophic problem. From this follows the corollary that every answer to this question has already been biased by the philosophic outlook of the author. Consequently, a complete appreciation of this question usually comes only when one's philosophical career has attained a relative maturity.

From the above, follows the first of the characteristics of philosophic thinking we are going to consider. (1) *Philosophic thinking is self-conscious in a degree higher than any other kind of thinking.* Let us examine this proposition.

In a sense, all thinking is self-conscious. The unity of self-consciousness, Kant held, is a basic presupposition of all knowledge. But, in non-philosophic thinking, this self-consciousness does not manifest itself as the determining principle. It is only philosophic enquiry which discovers the unity of self-consciousness, accompanying all knowledge ; and in this act of discovery, we are already beyond the level of non-philosophic thought.

What happens is this: in non-philosophic thought, the thinking self

externalises itself amidst the data (of reflexion) and is not conscious of itself as distinct from these data. In philosophic reflexion, the data have significance and meaning only in so far as they are relevant to the thinking subject. This is the general feature which may find expression in diverse ways: the thinking self may draw into itself all the diverse content of the data and determine their relevance to itself (Hegel) ; or, following a different procedure, it may gradually discover the complete irrelevance of the data to it and thus approximate towards a state of complete freedom from the shackles of the objective world (Vedānta).

This is what is primarily meant by saying that philosophic speculation is marked by a heightened self-consciousness.

The history of philosophy is amply illustrative of this. It is significant that DesCartes' " Cogito Ergo Sum " is made the starting point of modern European philosophy. This also explains the gradual transformation of the philosophical into the epistemological enquiry. Let us take one example. Contrast the anti-thesis of materialism and idealism with the anti-thesis of realism and idealism. The former centres round the question, if matter comes out of mind or mind comes out of matter ; the latter concerns the relation of knowledge to its object. My submission is that the latter is more truly a philosophical problem than the former. The former asks a question of historical facthood and *temporal* priority ; that is for the sciences to ascertain. The interest of philosophy in the historic or the pre-historic is only indirect.

Once this is apprehended, we soon begin to realise what is meant by the common saying that while the scientist looks outward, the philosopher looks inward.

(2) Thus far we have insisted that philosophic thinking is accompanied by a heightened self-consciousness. My second point is that this should not lead us to believe that philosophic thinking can be analysed into non-philosophic thinking and an accompanying self-consciousness of a higher order. (If that were so, the chief characteristic of philosophic enquiry would have been only a heightened egoism!!) On the other hand, philosophic thinking belongs to a distinctly higher level. *Non-philosophic thinking and philosophic thinking belong to two different levels of reflexion.*

In a sense, all consciousness is accompanied by some degree of thought. But what we call reflexion appears for the first time in scientific and historical thinking. This, we may call, reflexion of the first order ; here thought is of the objective data. As contrasted with this, philosophic thought is reflexion of the second order ; it becomes thought about thought. The object, here, is no abstract self-existent object. Hence, an important part of philosophic enquiry consists in thinking about the nature, limits and presuppositions of our other modes of knowledge. In this sense, it is said that philosophy is the criticism of scientific knowledge. Here, we

have already raised ourselves to a higher level of reflexion. Possibilities of yet raising ourselves to higher and higher orders of reflexion have been suggested by many thinkers (e.g., Husserl's " phenomenology " and Professor Krishna Chandra Bhattacharjee's " transcendental psychology ") ; but we need not enter here into those suggestions.

(3) The above discussion entitles me to lay down my third point. I would prefer to state it in two short propositions: firstly, *philosophy is an activity ; and secondly, philosophy is a spiritual activity.*

That philosophy is an activity may appear to be a truism. But even a truism often needs to be stated with emphasis. And this is particularly so in the present case, where there is every possibility of philosophy being identified with a body of truths or systems. Philosophy is anything but that. Even those philosophers of today who identify philosophy with history of philosophy, submit that this history of thought, in order to be philosophy, must be reconstructed by the reflective activity of the philosopher. Philosophy is philosophising.

Saying that philosophy is a spiritual act does not mean anything mystic or occult. The word " spiritual ", as used here, has no such significant. I only need emphasize this much, with regard to the use of this term " spiritual ", that philosophic reflexion constitutes the most essential part of the spiritual life of the philosopher. The relation of the philosopher to philosophic thinking is not to be merely external. Indeed, the philosopher is not to seek his salvation elsewhere. Here, in philosophic thought and here alone, is he to attain the final consummation of his spiritual life. This also ensures the thinker's highest freedom ; since thought *is* freedom, how much more so is philosophic thought!

(4) Now I think, the ground is sufficiently prepared to draw attention to two rather curious things about philosophy. It is usual to talk of philosophical *knowledge* and of such knowledge as being *reasoned.* We are to see in what sense, philosophy yields *knowledge* and in what sense, it is *reasoned.*

Philosophy, we have seen above, is a spiritual act and no body of truths or opinions. Is this activity of reflexion knowledge? Knowledge, in the popular sense, is of a body of truths. I may have knowledge of a scientific theory, of a mathematical formula, of a historical fact, or even of Kantian philosophy. But, in what sense, do I have really a knowledge of Kantian philosophy? Two interesting points are worth considering:—

(*a*) Kant, as is well-known, makes it necessary for all knowledge that its object must be given in sense-perception. This account of knowledge excludes from the purview of knowledge, all claims concerning such supra-sensuous objects as God, Soul, Immortality etc. What, then, about our claim to know Kantian philosophy? Philosophic reflexion is the critical philosophy,

with its analysis of pure forms of intuition and pure categories of the understanding, has no sensible objects, given for it. An enquiry into the presuppositions of knowledge cannot itself be knowledge. Kantian philosophy does not yield knowledge in the Kantian sense.

(*b*) Suppose, the Kantian definition of knowledge is rejected. But the matter is not made so easy. We may ' know ' Kantian philosophy, just as we know any other fact ; but what we would know in that case will not be philosophy. Because, as we have said above, philosophy is not a body of opinions. Philosophy is philosophical reflexion ; and Kantian philosophy means Kant's own philosophising. To understand Kant's philosophy, therefore, we are to place ourselves, to an extent possible on our part, in the actual process of reflexion that Kant's mind had enjoyed. And, then, we would only find that we have begun to philosophise ourselves. Where is the place of knowledge in the process of this reflective activity?

In any case, philosophic knowledge is not knowledge in the sense in which we ordinarily employ the term ; so that it becomes a travesty of truth when philosophic knowledge is defined as the sum-total of scientific knowledge or in similar other terms.

Now, there is left for us to consider in what sense philosophic knowledge is *reasoned* knowledge. Here, too, an apparent disappointment awaits us. Reasoned knowledge is knowledge, justified by accurate syllogistic deductions or adequate inductive generalisations. But observe the philosophic works of any great classical philosopher, and you meet with conspicuous absence of these two features of reasoned knowledge. Consider, for example, Kant's " Critique of Pure Reason ", or, take a more modern work, Professor A. N. Whitehead's " Process and Reality ". There is argument no doubt ; but there is not that sort of syllogistic deduction or inductive generalisation with which our text-books on logic have made us acquainted. The philosopher, no doubt, has his own arguments ; but he does not give us a perfectly reasoned scheme, such that one could follow him step by step from the most simple and accessible starting point. On the other hand, one is led by ' jumps ' and imaginative or reflective ' leaps '. There is often more of analysis than argument ; and analyses are, in many cases, intelligible only if the reader accepts certain presuppositions and by a stretch of imaginative sympathy or his own power of reflexion, places himself in the position of the philosopher's thought. But, am I obliged to do so?

In philosophy, one is so obliged ; for philosophic thinking does start from such presuppositions. Indeed, if we realise the meaning of what has been said above, that philosophy is a spiritual activity and is organically

connected with the spiritual life of the philosopher, this strain of dogmatism becomes intelligible. Being a spiritual activity, philosophy derives nourishment from the total spiritual life of the thinker ; and what appears as presuppositions, reflects only this inner source of nourishment. The philosopher, indeed, thinks with his whole being.

That is why, it is not an easy task really to understand a great philosophical system. That requires a whole life-time's reflexion on similar lines, accompanied by immense intellectual and imaginative sympathy. Indeed, really so to understand the thought of a master mind demands a definite adjustment of one's inner spiritual life. From this seems to follow a rather strange conclusion that possibly one cannot fully understand more than one of the great philosophical systems. For, at least here, one cannot be a passive recipient of theories ; and theories, when they are passively received, are not philosophy. *Thus, philosophy is certainly much more than merely reasoned knowledge.*

(5) We shall next consider the question *if philosophy is an autonomous activity*. This question may, in reality, take two forms:—

(*a*) Is philosophic thought a means to an extra-philosophic end? Amongst possible extra-philosophic ends may be counted religious self-fulfilment, social or political reform etc. etc. Is philosophy to be a hand-maiden in their hands? Or, is it an activity with its own inner purpose and a salvation of its own?

(*b*) Or, the question may be intended to ascertain if philosophic activity is independent of other activities of life, if it is one pursuit chosen by an individual, from amongst and in total exclusion of, others.

To the second form of the question, our answer will be in the negative. Such an assertion of the autonomy of philosophic reflexion would leave but an utter blank as the content of thought. I have described philosophic thought as a spiritual act and have emphasized its inward character ; but that does not, in the least, imply that it is thought without any content. On the other hand, philosophic thought is to start with as much fullness of content as is possible ; and this requires a width of vision and interest on the part of the philosopher, which is not consistent with the type of puritanic aloofness glorified by many.

I shall go further. To ensure a fullness of content, not only a width of vision, but also an intensity of experience is needed. But intensity requires concentration. Intensity can be gained only in a select field of experience. The philosopher, therefore, is to be intimate with some other field of activity. He may be a scientist (Whitehead), a mathematician (Leibnitz), a historian (Hegel), a poet (Schiller), a painter or musician, or even a social reformer (Bosanquet) or political revolutionary (Marx). From

some such field of experience, he will bring that sincerity, earnestness, passionate ardour and sympathy, which have a great bearing on philosophic speculation. Though one-sided, such speculation has it own value, in as much as it brings into clear relief an aspect of experience which would have otherwise remained unnoticed.

Now, we come to the first formulation of the question. Here, however, autonomy belongs to philosophy as its birthright. We have just now protested against that aloofness which is glorified in philosophers. We have emphasized that philosophic reflexion should start with a width of vision and an intensity of experience. But we are to add that in all these, the philosopher's ultimate end is philosophy and not anything else.

We shall illustrate what we mean by pointing out how we differ from a current point of view. Lenin has said that so long philosophers have simply contemplated ; henceforth they should change the world. The sentiment expressed is commendable. But the spirit of philosophy has been misunderstood. The philosopher may sincerely try to reform the world ; but philosophy, instead of being his hand-maiden for such extra-philosophic purpose, would rather be the ultimate purpose, to which all such experiences are to be directed. The philosopher's experience as a social reformer, his emotional ardour and sincerity, his understanding of man and history, his successes and failures, his regrets with the past and hopes for the future—all these would be for him so many factors to enrich his philosophic speculation. And this outlook distinguishes between a lay social reformer and a philosopher devoted to the same task. For the philosopher, philosophy is ultimate. His salvation does not lie elsewhere. In this sense alone, philosophic activity is autonomous.

(6) *Is there " Progress " in philosophy?* That is the last of the questions we are considering. Philosophic progress is always an embarrassing problem. The questions which were raised by Plato and Vedānta are as much discussed today as in the past ; and unanimity over a solution has never befallen the lot of philosophy. To label such problems as eternal is only a happy consolation.

Yet, for this, we need not despair. Even Immanual Kant felt embarrassed by this situation ; indeed, the prospect of ensuring for philosophy " the sure road of science " was one of the motives with which the " Critique of Pure Reason " was worked out. It is only obvious that the subsequent history of philosophy belies Kant's great expectations. Philosophy has not become a science. The fact is, philosophy can never become a science ; and whether philosophy progresses or not, the criterion of scientific progress cannot be applied to philosophy.

But, is there progress in philosophy at all? That the individual thinker achieves progress in his own speculative life is an indubitable fact. He comes to solve problems which once were insoluble to him ; he rejects

theories which were once advocated by him. In all these, there may be retrogression ; but there may be progress too. What is relevant however, is the question of progress in the history of philosophy. Has philosophic thought recorded a definite progress since Plato or Samkara? Or, is this idea of looking for progress everywhere a wrong approach, especially in the case of philosophy?

Whitehead speaks of adventures of Ideas. And he reminds us that the world of thought never recovers fully from the shock that a great mind imparts to it. This is an indubitable fact. The Socratic-Platonic distinction of knowledge from belief or opinion ; the Cartesian *Cogito ; Kantian* criticism ; the Hegelian idea of Dialectic development,—all these make all the difference in the history of thought which would have been inconceivably poorer without them. If they have not given us permanent solutions of certain problems and even if those very problems are rightly debated even now, they have nevertheless made some permanent contribution. They have, at least, lighted up some corner of truth, where no further illumination is called for. Or, if this is too big a claim, they have departed from their predecessors at such vital points, as are bound to leave their impressions on the history of thought. Take, for example, the Kantian conception of a priori ; it would be only a very modest claim that it has, for ever, replaced DesCartes' innate ideas. Or, take the more revolutionary example of Hume's analysis of causality. Will you find a single case of analysis of this concept in Post-Humean thought which has not been influenced by Hume's? In many cases, there might have been a return to the past ; but this return is never naive ; such return inevitably bears the stamp of the intervening ideas. The whole line of analysis of a problem gets reorientated. Whitehead is thus correct. Not only is it true that the ideas introduced by a master-mind leave their impression on all subsequent speculation ; there is also the no less significant fact that after such a shock, even the past comes to us in a new light.

Hegel goes further ; for him, history of thought registers a steady progress,—a progress not linear but dialectic. In Hegel's philosophy, philosophy is the final synthesis of a triad whose thesis and anti-thesis are subjective spirit and objective spirit. Inside philosophy, again, there is progress. This is, however, a view of progress which is acceptable only to those committed to the Hegelian system.

In any case, this much is clear that philosophy has not remained static ; there has been progress. Collingwood, in his " Idea of History ", defines the nature of this progress thus:—

" If thought in its first phase, after slowing the initial problems of that phase, is, then, through solving these, brought up against others which defeat it ; and if the second solves these further problems without losing its

hold on the solution of the first, so that there is gain without any corresponding loss, then there is progress. "

This is a reasonable and cautious statement. Applying this criterion, Collingwood endeavours to show that while in the case of art, morality and economics, in one sense there has been progress and in another, none ; in the case of science, philosophy and religion, progress can be unequivocally predicated. " Philosophy progresses ", he tells us " in so far as one stage of its development solves the problems which defeated it in the last, without losing its hold on the solutions already achieved ".

But, it may be asked if, in philosophy, there is any solution already achieved. Lack of unanimity over a single question has been our main source of despair. Aristotle might have accepted something of Plato, rejected a part and substituted his own answer ; but,—this is the example Collingwood discusses,—to say that Aristotle progressed over Plato is a highly controversial proposition.

Radically distinct as science and philosophic speculation are, to seek in the latter for the same pattern of progress as characterises the former is a fundamentally wrong approach. Even in science, no theory is established or discarded once for ever. To take the most common example: the corpuscular theory of light, first replaced by the wave-theory, has again been revived in the quantum theory. In philosophy, such reappearance of old theories, though reorientated by all subsequent and intervening speculation (e.g. naive realism, reappearing in the guise of neo-realism and representationism as critical realism) is only a common feature. But this is no original sin of philosophy alone. History, they say, repeats itself ; and history of science is no steady progression from unanimity to unanimity.

Giovanni Gentile, the Italian neo-Idealist, takes a more radical view of philosophical progress, which is certainly flattering to the student of philosophy. Progress requires a history. According to Gentile, it is philosophy and philosophy alone which has history ; all history is history of philosophy. Neither art, nor religion, nor science, truly speaking, can have history. To take the case of art: a work of art is a ' selfenclosed individuality ' ; hence a history of art, in so far as it is art, is inconceivable. " When we are looking at art, we do not see history and when we are looking at history we do not see art. " (Gentile—Mind as Pure Act. p. 226). So also of religion and of science. In the case of science, Gentile argues rather in a Platonic manner ; there being a definite reality to know, " either we know it or we do not know it. If it is partly known and partly not, that can only mean that it has separable parts, and then there is a part which is completely known and a part which is completely unknown. " (Ibid. p. 234). What is called history of science is, therefore, for him, for the most part " an enumeration of errors and prejudices, which ought to be relegated to the pre-history rather than to the history of science. " As contrasted with

these, philosophy alone has history ; and any other history, either of art, or of religion, or of science, is nothing but history of philosophy. It follows that if there be progress anywhere, it is in philosophy and philosophy alone.

This is an eloquent defence of philosophic progress ; but, as in the case of Hegalian dialectic, so also here, we are needed to make a prior acceptance of the underlying metaphysic. But it, at least, shows that philosophic progress need not be for us as embarrassing a problem, as it appeared at the start.

As regards unanimity over philosophical problems, we have already suggested an answer by implication. If philosophic reflexion is always nourished by the thinker's spiritual life, it is only natural that precise agreement is not consistent with what belongs to the essence of philosophic attitude. We, therefore, do not share Professor Lovejoy's optimism expressed in his Presidential address before the American Philosophical Congress of 1917 (Philosophical Review, 1917). Professor Lovejoy, therein, expresses the hope that by following certain rules, which he, with commendable clearness, prescribes, philosophers can attain to that ideal of unanimity, which scientific enquiry has placed before us. But that would run counter to the entire philosophical attitude elaborated above.

In any case, there is no cause for disappointment. How much soever at variance the reflections of the philosophers may be, they all come and join one stream of thought. Hence the supreme importance of the study of the history of philosophy. Mr. Eliot has suggested " the conception of poetry as a living whole of all the poetry that has ever been written " (Selected Essays, p. 18) and has prescribed for the poet a historical sense, a consciousness of tradition. A similar suggestion may be emphasized in the case of philosophy, too ; otherwise, it would not be possible to appreciate the very difficult question of philosophic progress.

The Medium of Drama : Verse Vs. Prose *

ANSHUMITRA DE—*Sixth Year English*

THE question which is the better medium of drama, verse or prose, involves the more fundamental question of the aim of drama. Drama is an emotional representation of life, an attempt to put forth into concrete, exterior form our vague feelings and ideas about it. The world we see is also a representation

* Read before the English Seminar.

often hindered, baffled and so rather prosaic and dull. In drama people may be less disturbed by what they are, exposing themselves and setting off others. Let us take a play by Shakespeare, say, ' Julius Caesar. ' Cassius, a sneaking conspirator pitted against the greatness of heart that is Brutus, Brutus and Caesar, the philosopher and the proud conqueror, each noble in his own way, set one another off by similarity and contrast. They serve to make a sufficiently significant pattern of life, life ordered and idealised, and intenser than the one we live.

The essential part of a dramatist's art is, then, to show the reality behind the appearance, to lift, as Shelley would say, the veil from the hidden beauty of the world. Drama has a spectacular side ; in it the appearance tends to be all if the dramatist is not careful enough. Here he needs a language which is capable of expressing thought and emotion combined, a language with an appeal past reason, past consciousness, to our entire sentient being. A merely rational vocabulary and syntax will not suffice in drama, not at any rate in tragedy. Tragedy is a literary form that calls for a stately yet free utterance ; lofty, and, at the same time, plastic enough for the minutest, the most delicate shades and nuances of human feeling and character and for the natural modulations of conversation. It may be in prose, or it may be in verse ; the point is that the language must be right and inevitable in its particular dramatic context, and somewhat raised above the dull speech-habits of this work-a-day world. If prose, the prose must have some sort of rhythm to keep our answering emotions to the necessary state of excitation ; it must be a prose merging into poetry. If it is verse, the verse must be easy, natural, free from the conscious artistry of the verse, say, of ' Paradise Lost ', which, sublime as it is, would be ineffectual for drama.

As for the argument that verse is removed from the language of real life, even the language of realistic prose drama is not an exact reflection of that. On the other hand, it involves considerable selection,—it has to, or the drama would fail as a work of art.

When we talk of verse in English drama, we mean, to all intents and purposes, blank verse. With the presentation of characters involved, it is a question not merely of what man thinks about himself, or whatever part of that he may be willing to disclose, but also of the things he does not know about himself. These things are diverse, often contradictory. Only blank verse with its sudden variations and modulations of metre—most powerful suggestions of shifting changes and unexpected rushes of emotions—can give us a direct expression of these. Moreover, it is so free with irregularities such as trochees and triple feet that it easily approaches the effect of prose.

We wonder at the subtle effects achieved in Shakespeare's plays by alterations of verse and prose. For prose can do very well in moments

when the tension of the drama is low and thus intensify the effect by throwing the serious moods into relief against the lighter ones. Thus,in 'As You Like It ' we find Rosalind and Celia talking in a happy, carefree way—Celia teasing her cousin and the latter answering her good-humouredly. The dialogue is in prose with the clear-cut edge and sparkle of a diamond. Then comes—the usurper duke, and as he enters the medium of the drama is shifted to verse. A sense of hush and a premonition of some indefinite dangers fall upon us instantly. And even before we are told of his resolve to banish Rosalind, we almost know it. In tragedy prose has the additional effect of providing relief to the strained nerves of the audience. The storm-scene in ' King Lear ' serves as an illustration. Shakespeare provides relief and at the same time intensifies the effect of the drama by interposing short prose—scenes in the castle between Lear's larger and exciting ones in verse. All this would have been impossible if prose had been the medium of drama in Shakespeare's time.

Shakespeare sometimes shortens his verse-lines as when Brutus soliloquises on the night before Caesar's murder.....

> 'Since Cassius did first whet me against Cæsar,
> I have not slept. '

The line is short by some six syllables, the usual blank-verse line consisting of ten. The pause beautifully suggests the weary gesture of one torn within the soul, between friendship and loyalty to one's country. Or, let us take the prison—scene where Claudio speaks to Isabella in a paroxysm of despair, the passionate instinct of the living to clasp life proving too strong:

> '. . . . . 'tis too horrible!
> The weariest and the most loathed worldly life
> That age, ache, penury and imprisonment
> Can lay on nature is a paradise
> To what we fear of death.'

Some four syllables are wanting here ; the gap suggests a moment of awful suspense, before his sister can find words for her feelings.

Or sometimes Shakespeare cuts up his lines among speakers. Thus, in the chill, dark night Hamlet follows his father's ghost along the coast-line ; Marcellus and Horatio try to hold him back with ' you shall not go, my lord. ' Hamlet's excited, impatient ' Hold off your hands ' completes the line. We almost visualise a scuffle and Hamlet tearing off from his friends. Shakespeare achieves this unique effect of an impatient rapidity of movement by a very simple device, that of dividing a line among these three speakers. He cared little for stage—directions, those artificial and external elements in drama. His plays contain few stage-directions except ' enters ' and ' exits '. Modern play-wrights, on the other hand, seem to be especially fond of stage-directions, for they would explain every little thing to the audience. Shakespeare's method as a dramatist is more subtle.

He suggests, never explains his meanings, by arranging and shaping his medium for his end. His effects are intenser and more dramatic. But could he perform these wonders if he had to work with prose with all its stiffness?

The use of significant and memorable phrases is a part of the dramatist's craft. It helps us to keep in mind the characters that pass out of sight and reappear only occasionally, or after a long interval. Let us take an example from ' Macbeth '. We leave Lady Macbeth in the banquet-scene, disillusioned and weary with want of sleep. A long series of murders, witchcraft and preparation for battle follows. And yet among all this, the dim figure of the unhappy queen of Scotland haunts us until we meet her face to face in that dreadful midnight scene in the castle, a mighty wanderer with her memory zig-zagging through the horrors of the past. Shakespeare has achieved this end by using and often framing phrases charged with much more than their immediate meaning, by which a whole character may be revealed and a whole situation summed up. Only a poet has the secret of this ; he is free to coin expressions for his need. Prose, on the other hand, is too realistic, too clumsy an instrument for drama, and its scope too restricted.

And we must consider the lyric release afforded to pent-up emotion by songs in Shakespeare's plays or by the choric odes in Greek tragedies. It would never have been possible in prose.

The advantage, if not the necessity, of heightening language for deeper effect is obvious. But the modern tendency in literature is towards something more like life. A play is supposed to be the composition of several persons speaking extempore, which is ever done in prose. People interested in the theatre would now have the illusion of an uncalculated succession of events, and expect to have it in a vulgar tongue. Even responsible people seem to think that way. Max Eastman even suggests that Aristotle regarded drama as a division of poetry simply because prose-plays were unknown to him.

One wonders why we use words in drama to characterise and help the action, which is hardly their job in life, and yet would not let them be in verse though that may help the expression.

Of course, prose can occasionally rise to poetic heights by acquiring simplicity and brevity. It did so with Maeterlinck and Ibsen. But prose can do this rarely. Under the strain of emotion, as Maxwell Anderson puts it, the ordinary prose of our stage breaks down into inarticulateness ; hence realistic drama in which the climax is reached in an eloquent gesture or a moment of meaningful silence.

But there is yet another point to consider. We accept unrealistic speech in a play laid in foreign countries or in a period of long past. But one would like to have plays on contemporary themes for greater immediacy of interest, and can such a play be written in blank verse? It is generally felt that

Shakespearian blank verse cannot be used in these days with the greatness and naturalness that made it right for Shakespeare ; it is too conventional now and too full of unconscious echoes. Perhaps some other rhythm, possibly more abrupt and harsh, is needed to express the characteristic moods and speech-habits of our time. Some modern dramatists, T. S. Eliot and Sean O'Casey among them, seem to search for a verse they need with a sense of the particular dramatic use it will have for them. But the question cannot be answered by mere theories. It must wait on the creative genius of the ppets themselves.

Meanwhile, the traditional poetic speech can still be beautiful in a play. Let us take scene iv, Act II of Auden and Isherwood's ' Ascent of F6. ' On a stormy afternoon up Mount F6 Michael Ransom speaks over the collapsing body of his comrade—

'You always had good luck ; it has not failed you
Even in this, your brightest escapade,
But extricates you now
From the most cruel cunning trap of all,
Sets you at large and leaves no trace behind,
Except this dummy.'

The diction is simple and conventional here: it is in fairly regular blank verse, and with echoes from Shakespeare, too. Yet how fresh it sounds and how vividly it expresses a moving situation.

Perhaps in passages such as this we see how a modern dramatist can still speak in a language which is beautiful both as drama and as poetry.

Bernard Shaw

RANAJIT KUMAR BASU—*Third Year Arts*

JOAN had to wait for centuries together before she was canonised. But Bernard Shaw had not to wait, his fame was established firmly before he died. He was often compared with Shakespeare. He was popular not only with learned men but with common men. On what does his fame rest? Learned men can appreciate the subtlety of his dramatic art. With common men it is a different matter altogether. They cannot realise his greatness as a dramatic artist. But they admire him for his social and moral views.

For his social and moral views he was greatly indebted to Ibsen who was introduced to the English by writers like Edmund Gosse and others.

Ibsen's social and moral views have greatly influenced him. But his contact with Ibsen and his views did not bring the revolutionary change in his mental attitude which was already there. The un-orthodox trend of his mind was evident before he knew anything about Ibsen. According to Ibsen, the real slavery of his day was the slavery to the ideals of goodness. Shaw heartily accepted this. He was also influenced by Ibsen's judgment of ideals and idealists. So he claimed the right of judgment against the conventional habit of professing allegiance to accepted institutions.

To Shaw the practice of questioning the accepted standards of belief is the beginning of goodness. Anything that is popular should be looked upon with suspicion. He declared that good institutions are thought to be good only because it has become a custom to accept them as good. So he warns us against confusing what is right, what is virtuous and what is customary.

Some writers before Shaw attacked sentimentalism. But it was deep-rooted in English character. Other social critics made a distinction between sentiment and sentimentality. They thought that sentiment is the offspring of romanticism. But Shaw suspected romanticism because it is responsible for sentimentality. He seems to have no reverence for the past. " Sponge out the past," he says, not because it has nothing to teach but because we must re-write its faded scripts ourselves. Let us have new vision and adventure and escape from the tyranny of the past to wider horizons and free and unrestrained thoughts. "Every generation must have its fresh and fearless expression, " he says. According to him, cruelties of society are practised by kind people who have ceased to feel and whose understanding is paralysed by traditions. He was pre-occupied with this notion and attacked society with his shafts of satire and mockery.

He sometimes hampered his literary ability by subordinating art to moral passion. He was a crusader whose life work was the endeavour to build Gerusalem. The eighteen-nineties were the days of art for art's sake. But Shaw could find no justification for that art which is not controlled by moral passion. He was a preacher. " Whatever medium he takes, he converts it into a pulpit and his utterance is always a sermon. " His motto was—art for life's sake. His theme was not art but life. "For art's sake alone I shall not face the toil of writing a single line. " He was a natural literary artist fettered by reforming zeal. His plays reveal a struggle between the moralist and the artist.

He was not a vain man although he said more vain things about himself than anybody else. His gospel is revolting to the general public. He is looked upon as a public annoyance. He calls us to repentance, disturbs our comfortable routines, breaks our respectable idols and shatters our sacred conventions. In order to fulfil his purpose it was necessary for him to draw the attention of the public. "In order to get a hearing," he says,

" it was necessary for me to attain the footing of a privileged lunatic with the license of a jester. " He was a natural-born " mounte-bank " as he has admitted himself. He behaved consciously as a " mountebank " employing the weapons of laughter and ridicule to attack bad housing, bad education and bad conditions of labour which troubled him deeply. He has not converted his generation, but irritated and puzzled it. He has ever been a pungent and out-spoken critic of his age.

It was sometimes argued that Shaw was a destructive force in the modern society for his revolting attitude. His attitude is not orthodox. His idea is that we must shun dead customs and conventions. He is an optimist who believes that " the best is yet to be " and growth is the law of our being. To nourish that growth the vital flame must not be quenched by custom and convention. It must be eternally renewed. So Shaw is never a cynic. The secret of his fame lies in his courage to adopt such an unorthodox attitude and to make people conscious of their blind adhererence to traditional beliefs.

Keynes and Marx *

AMARESH BAGCHI—*Sixth Year Economics*

IF a student of Economics was asked to mention two prominent figures in his field of study, belonging to the last hundred years, the two that are most likely to spring to his lips are Karl Marx and Lord Keynes. Not that there is any dearth of thinkers worth mentioning in this branch of human learning, yet it can be stated, without fear of contradiction that in recent years no one else has influenced the course of thinking in this science, more profoundly than these two great sons of Europe. There is, for example, Alfred Marshall, whose contribution to the study of economics can hardly be minimised. The contribution of Keynes and Marx, however, is of a different kind. As a matter of fact, what Marshall did ultimately amounts to a refinement of the tools of thought existing at that time, and to the addition of a few new weapons to the armoury of economic analysis, or at best, a brilliant synthesis of different schools or branches of Economics, and his voice was not heard beyond the four walls of academic economics. But the impact of Keynes and Marx was not confined to Economics alone

* Adapted from an article read at the Economics Seminar of Calcutta University on Dec. 4, 1950.

but was felt also in other allied sciences such as Politics and Sociology. Breaking away with their past ties, both of them, in their respective ways, diverted the stream of thought to altogether new channels. Thus setting off in new directions, they succeeded in opening up new horizons.

Besides, the questions with which they concerned themselves are precisely those with which the future of human society is bound up. Is capitalism merely a stage in the evolution of human society? Does it contain the seeds of its own destruction? Or is there any possibility of its survival in the face of the severe problems that beset it from time to time, particularly in its advanced stage? These are obviously questions in which we are all vitally interested to-day. But, again, these are the very questions that Keynes and Marx tried to answer and actually did answer in their own ways. And it is interesting to note that while the conclusions reached by one (I mean Keynes) go in subdued favour of the present system, those reached by the other (*i.e.*, Marx) go unequivocally against it. And to form an opinion, one is left bewilderingly to choose between the two.

A comparative study of Keynes and Marx, therefore, appears very tempting not only for students of economics, but also for laymen having some interest in the things going on around them. But like most comparisons, interesting and instructive, no doubt, it is difficult and what is more, it tends to be deceptive and hence dangerous. For, inspite of the fact that the ultimate ends they had in view were avowedly different, the problem that engaged them was essentially identical in nature (viz., whether capitalism will survive or not). But, again, inspite of the fact that the problem that they took up for their study as also their final views on its solution had much in common, there remains an inseparable gulf between them:—while one was a relentless critic of capitalism, the other was its apologetic defender. That is to say, there are points of agreement as also of difference between the two, both fundamental and superficial. And in course of a comparative study they appear and disappear simultaneously and so often, that we run the danger of overstressing the superficial similarities forgetting their fundamental differences or conversely. Instead of merely enumerating the points of their agreement and difference, I propose therefore, to give an outline of the fundamental points first and then come to points of detail.

Economics, for Marx was indespensable for an understanding of human society and particularly its evolution for, according to him, as Sweezy puts it " society is more than a number of individuals. It is a number of individuals among whom certain stable and more or less definite relations exist. The form of society is determined by the character and form of these relations. "* And the character and form of these relations again are moulded by the system of production obtaining in that society.

* Paul Sweezy—"Theory of Capitalist development".

Taking up the study of Economics, thus, as forming the steppingstone to an understanding of the complex superstructure of social relations, Marx next tried to show that capitalism is a system that fosters such a relationship between the different classes of the society, that goes against its long-run interest. Relations set up by the system of production obtaining under it are bound to eat up the system itself. Speaking in a less general and more technical fashion, he attempts to show that in capitalist system of production, labour (which he assumes to be the source of all value) does not own the factors of production with which it has to work and does not get the full value of the product of its labour. On the contrary, a large part of it (the value of the product) goes to the capital owning class,—called " exploiters " in this sense,—with the result that capital accumulates in the hands of the capitalists. And the most interesting fact is that this increasing capital accumulation reduces so much of its profitability that the growth of the system is thwarted. And herein lies the contradiction. The system, by its very nature, begets capital accumulation, which in its turn begets a falling tendency in the rate of profit ultimately choking up the system.

In Keynes, however, we find a laborious student of what we have come to know as pure economics, striving, under no desire to change the existing system, to diagnose the chronic diseases from which the capitalist society of his time was suffering. Unlike Marx, he did not start in a violently unorthodox manner, but arrived at quite unorthodox ideas. The ultimate results that he obtained have not yet been fully established and debate rages even now over their interpretation. But broad outlines can certainly be presented.

Stated briefly, Keynes' theory seeks to show that capitalism suffers from a chronic tendency toward ' underemployment ' or ' under-full '-employment. Because, contrary to the supposition of classical economists (with whom, however, the problem of employment was not so serious), an injection of new investment into the economy, does not lead the system automatically to full employment, *i.e.*, does not " perpetuate " itself until full employment is reached, but stops short at just that level of income and employment that suffices to provide an equal amount of saving in the normal course. And if this level falls short of the required full employment level, the cause is that, either the amount of investment is small, or that consumption (which increases with income, but at a relatively diminishing rate) is so low that income need not rise very much to provide the amount of saving to correspond to the new investment. If investment, that is to say, holds the key, consumption sets the pace. Investment however is governed by the " marginal efficiency of capital " along with rate of interest (which according to him is but the reward for parting with liquidity), while consumption is governed by the marginal propensity to consume, a psychological law, showing how much a community can be expected to consume at different levels of income. Unemployment can be got rid of, it follows from the

above analysis, if either sufficient amount of investment is undertaken (whether public or private) or if consumption is sufficiently stimulated (through, say, redistribution of income through taxes, from the rich to the poor, who consume relatively more). The prospect of capitalism, he thus tried to show, need not be so dark as was made out by Marx. On the other hand, all its benefits can be enjoyed without paying in terms of unemployment and wages, if we are bold enough to follow up this prescription.

This analysis sounds more academic and its conclusions appear less sweeping. To examine the question why this is so, will take us directly to the gulf that separates the two.

Marx was a philosopher-economist* of the nineteenth century with a a background of materialist philosophy and Hegelian dialectics, to whom the conditions of the labouring class at that time seemed intolerable and whose primary interest was in the society as a whole and more especially in the process of social change. "Legal relations as well as forms of state," he thought, could neither be understood by themselves, nor explained by the so-called general progress of the human mind, that they are rooted in the material conditions of life, which were summed up by Hegel after the fashion of the English and French philosophers of the eighteenth century under the name ' civil society. ' " " The anatomy of that civil society, " he declared, " is to be sought in political economy. " Political economy—the " anatomy " of society, is significant according to him not primarily for its own sake, but because it is in this sphere that the impetus to social change is to be found. It may not be true to say that Marx was trying to reduce everything to economic terms. He was rather attempting " to uncover the true inter-relation between the economic and the non-economic factors in the totality of social existence. "

The approach of Keynes, was, to repeat, from an entirely different angle. It would be wrong to assert that he worked under no " motives ". Rather, it would be true to say that pestered by severe crises, he, as a faithful student of economics, undertook to salvage capitalism by discovering the factors lying at the root of the malady and to control them, if possible.

I do not want to impute 'motives', in the vulgar sense, to either of these great masters, or doubt their intellectual honesty. But these are facts important to remember and we must keep them constantly in view, if we seek to understand the real differences. For this is where they started from and this is what colours their methodology and conclusions and even runs into details.

As for methodology, from the very nature of the respective purposes

* An interesting remark made in this connection by the late Prof. Benoy K. Sarcar often in the Post-Graduate classes may not be out of place. " Marx as an economist, he used to say, "would get zero. But as a philosopher, he would get cent per cent marks from me."

of their study, methodology was bound to be different. Even when the variables they analysed were essentially same, the names under which they took them up were different. And even when the function that a variable performs in the two systems was fundamentally identical, the perspective in which it was set was different. As for instance, the fact that there is a historical tendency for the profitability of capital to diminish, is derived laboriously by Marx through an elaborate analysis of simple reproduction, complex reproduction, composition of capital, surplus value, etc., (leaving an overtone of reprobation ringing in the minds of readers), whereas Keynes calmly takes it up to assess its importance in the determination of employment and racks his brains over determining whether and to what extent it can be checked. The way in which Marx carried his analysis might appear to some as unnecessarily tortuous and at some points, inconsistent. But his methodology is remarkable at least for its suggestiveness. The purpose of Keynes however, is more implicit in his writings and does not manifest itself through methodology so obviously (and some might add, so " obtrusively ") as it does in the case of Marx.

So far I have focussed my attention only on differences. How these primary differences work themselves out in conclusions yet remain to be seen. So far it may have appeared that there was no common ground between the two excepting that both were interested in the future of capitalism (though in different ways) and that both carried their analysis in terms of aggregates (*i.e.*, total employment or output, though Keynes from a short period, while Marx from a long period point of view) and did not engage themselves in fruitless pursuit of microstatics.

It will no longer be possible, however, to speak of differences without noting how often and how significantly they agree. For, curious and ironical though it is, in their diagnosis of the capitalist malady, there is astonishng agreement between the two.

For the fundamental cause of the malady, according to both, is the lack of adequate investment, caused by its diminishing profitability. There is some agreement even in their estimate of the cause of this diminishing profitability. Both of them think that profitability declines because consumption is not high enough. But Marx goes farther and tries to analyse why consumption is not high enough. And this he shows by means of his theory of surplus value, which means that much of the product of the society goes to the rich, who consume less than the poor, labouring class.*

---

* Strictly speaking, Keynes' theory of propensity to consume does not exactly tally with what is said here. For, it is after all, a psychological law stating that after a certain level of income is reached, the consumption of the community does not increase at the rate at which its income rises, i.e. the marginal propensity to consume is a fraction less than one. This law would hold, even if income were equally distributed in the community. But, broadly speaking, the interpretation given above is not incorrect, for, the fact of inequality does form a large part of the cause of the marginal propensity to consume being less than unity.

And, secondly, Keynes makes an unintended concession to Marx, when he says that investment virtually holds the key, and either we must keep up opportunities for our investment, private or public, or perish (which means complete socialisation of economic activity). Whether Keynes' hopes are realised, however, only time can show. For it depends on a number of factors, ranging from how far scientific advancement helps to open up new investment opportunities and how far we are capable of forseeing dangers ahead and of planning our actions accordingly.

But, it must be noted that the above analysis, showing the affinity of Keynes with Marx assumes a particular intrepretation of Marx's views on crises, which may not be wholly acceptable for many of his ardent followers. And it is doubtful whether the theory of crisis that has just been presented strictly follows from Marx's logic. And may be, the picture of agreement between Keynes and Marx that has been given in the preceding paragraph, is perhaps a little overdrawn. Marx's theory of crisis, therefore, needs a closer examination.

But, in fact, there is no systematic discussion in Marx about crises and what has come to us has large elements introduced later by his interpreters and devoted followers. And there is bitter controversy among the followers themselves over Marx's exact views on this point. Some (like Tugan Baranowsky and Maurice Dobb), associate his name with the disproportionality theory, viz. that crises occur out of the disproportionate growth of the different branches of production in capitalism, particularly out of the disproportionate growth of the consumption goods production in relation to capital goods production. But this attitude is decried by others of the Marxist camp as betraying a revisionist outlook. And they bolster up the under-consumption theory of crisis, whereas, according to their opponents, Marx had clearly refused to be branded an underconsumptionist.* Keynes, himself, however, thought that his own theory had its imperfect origin in Malthus, who was pushed aside by Ricardo, and " it could live on furtively, below the surface, in the underworlds of Karl Marx, Silvio Gesell, or Major Douglas." (*General Theory*).

But, again, Marx's theory of under consumption was not so consistent

* M. Dobb in his "Political Economy and Capitalism" quotes this passage from Capital (Vol. II) to establish how emphatic Marx's repudiation of "Effective Demand" was:—"It is purely a tautology to say that crises are caused by the scarcity of solvent consumers or of paying consumption. . . . If any commody is unsaleable, it means that no solvent purchasers have been found for them, in other words, consumers (whether commodities are bought in the last instance for productive or individual consumption). But if one were to attempt to clothe this tautology with a semblance of profounder justification by saying that the working class receive too small a portion of their own product, and this evil would be remedied by giving them a larger share of it, or raising their wages, we should reply that crises are precisely always preceded by a period in which wages rise generally and the working class actually get a larger share of the annual product intended for consumption." A foot-note to this passage adds, "Advocates of the theory of Rodbertus are requested to take note of this ."

as the theory of Effective Demand developed by Keynes. It may be that Marx had vaguely divined what Keynes later corroborated. But this does not seem probable in view of the surprisingly classical, (and after all, he was last in the line of classical economists!) orthodox, and anti-Keynesian views of Marx on the question of the relation between wages and unemployment. What Marx said on this point shatters all attempts at linking the theory of Keynes with that of Marx. And we are finally left in a void to guess what constitutes Marx's theory of crisis proper.

It remains to be answered, therefore, what exactly is Marx's theory on this point that fits in satisfactorily with his analysis and views regarding other associated problems. It remains, further, to be seen, what similarity, if any, it has got with the theories of business cycles which modern economics offers us. An answer to this might also help to provide us with a reply to that vital question, that still makes us uncomfortable, after all this discussion, namely, " What, then are we to conclude,—' capitalism cannot and will not live but yield to another (better or worse, we know not) form of society or ', ' it will be possible for it to survive any impending disaster '?" Or what comes to the same thing, whose hopes were ultimately justified,—of Keynes or of Marx? "

For a student of economics there are other points of interest in this study. Taking up minor details or even particular terms he may go on to find out how astonishingly they resemble one another. How, for example, Marx's total value of product comes almost to the same thing as Keynes' concept of total income. Or, how a counterpart to Keynes' theory of interest can be found in Marx and how they compare. I may go on multiplying instances. But, in my opinion, it is neither prudent nor necessary to dwell upon this in a general and brief study of this type. For, these though (they are highly instructive and may supply some important hints and help in resolving doubts about specific points) have but little bearing on the main issues with which I have dealt here.

In conclusion, I would like to emphasise that economics even to-day is faced with a host of questions, to which neither Marx nor the academic economists, classical or modern, provide satisfactory answers and the impression which it gives of the present state of economic knowledge is not encouraging.

The outstanding questions confronting economics to-day may be divided into two groups: those which concern the division of the social product, and those which concern the size of the product. To the first group belongs the question of the profit margin, on which modern theory has not much to say, as well as the complex question of the relationship between real and money wages.* If this question is somehow solved, it would simplify the other

---

* Joan Robinson—An essay on Marxian Economics—(Pages 92-4).

problem to a great extent and pave the way for its ultimate solution, which, let us not forget, neither Keynes nor Marx could give us.

Renewed examination of the basic elements analysed by these two great thinkers may help us a lot in this regard. The study of the supply of capital appears to be inadequate in modern economics. Particularly, the overthrow of the orthodox notion of an equilibrium supply price of capital leaves a huge gap in our analysis. "The problem must rather be approached," as Mrs. Joan Robinson suggests, " as Marx approached it, in terms of history,—the stock of capital at any moment is the result of development in the immediate and remote past, and the stock of capital in existence is an important factor in the determination of its own rate of growth."* And the problem of effective demand, which constitutes another part of the problem of the size of total output, may be examined under the Keynesian categories of the propensity to consume and the inducement to invest. And, it may be found that, inspite of this hard core of difference between them, Keynes and Marx supplement one another. And taken together, their teachings, if not obscured by dogmas of the left and the right, may prove to be of immense benefit to mankind.

Radar—Its Elementary Principles

DEBA PRASAD DATTA—*Fourth Year Science*

SOME thirty centuries ago Greek shepherds tending their flocks amidst the hills of their rugged country were astonished to hear words repeated from the hills although nobody was to be seen there. They could gather no scientific explanation for this fact and they conjured up the myth of a nymph Echo who was cursed by Juno. But those shepherds could hardly dream that their nymph Echo was nothing more than their own voices reflected from the hills.

Sound, as we all know, is nothing but waves in air, and it travels nearly at a speed of eleven hundred feet per second. This wave motion is not peculiar to gases only but it can pass through liquids and solids also. But the velocity is different in different media. If we make a sound at an instant and hear its echo just after n seconds then the reflecting surface is nv/2 feet away from us, where v is the velocity of sound in that particular medium. This is explained by the fact that the sound wave has travelled double the distance between the listener and the reflector in n seconds. This simple method of measuring distances has been extensively used so long. The depth of seas is also measured in this manner, the sound being produced in the water and received by a special apparatus in the ship and

* Joan Robinson: *An Essay on Marxian Economics.*

the bottom of the sea acts as the reflector. The knowledge about the method of echo-sounding is not exclusively possessed by man. Recent researches have shown that bats also make use of this. They utter high-pitched cries, much too high for human ears, and they hear the echoes and from this they find the distance between the obstacle and themselves. This has been proved by the fact that bats can fly avoiding all obstacles even when they are completely blind.

The credit of applying the technique of echo-sounding with radio waves instead of sound goes partially to Marchese Marconi who demonstrated in 1900 that long distance wireless transmission was possible. This observation was contrary to the prediction made by the mathematicians that wireless waves cannot scatter sufficiently to get round the curvature of the earth for any great distance. This discrepancy between theory and reality was explained independently by the English engineer O. Heaviside and the American Professor A. E. Kennelly as due to radio-reflecting surface in the upper atmosphere. In 1924 the renowned English physicist Sir Edward Appleton discovered that layer and named it Kennelly-Heaviside layer. He found that its height varied from 55 to 70 miles above the sea-level according to the time of the day and the season of the year. A few years later Dr. Gregory Breit and Dr. Merle Tuve of the Carnegie Institution of Washington showed that the short sharp radio pulses might be used in the echo-sounding technique. But this project faced great difficulty. Radio waves travel at the speed of light *i.e.* at 186,000 miles per second. Thus to measure distances within ten miles it is necessary to measure time intervals of the order of 1×10^{-4} seconds. Thanks to the tireless efforts of the scientists this measurement is made possible by the instrument known as the Cathode Ray Tube (C. R. T. *See* FIG. 1). This instrument is in effect

CATHODE RAY TUBE

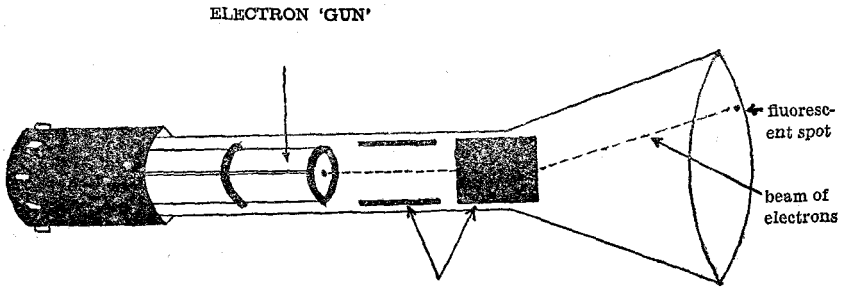

Two pairs of deflecting plates at right angles to one another

FIG. 1

a kind of an electron "gun" which contains a hot wire as the source of electrons. The issuing electrons are formed into a beam which is concentrated to the size of a pin point. There are also two pairs of deflecting plates at right angles to each other. The shape of the instrument is roughly like

a funnel with the electron source at the narrow part, and the beam of electrons focussed on the fluorescent screen at the other end as a bright dot. The electrons are the lightest substance known to science and as such they are deflected by even a very slight electric impulse. In an actual radio-sounding apparatus short and sharp pulses are discharged at an even rate, say at every one-fiftieth of a second, and the time interval between the discharge of the pulse and the reception of its echo is one-thousandth of a second. During all this time one pair of deflecting plates make the spot move from left to right, and the motion is made in such a way that every time the spot starts moving from the extreme left position towards right an electric pulse is transmitted. That is to say, the spot begins to move from left to right in every one-fiftieth of a second. Another pair of deflecting plates is arranged in such a manner that when a pulse is being transmitted at the very beginning of the left to right motion of the spot it makes the spot make a jump upwards. But since the pulse is momentary (about 1/20,000 sec.) the spot will almost instantly return to its former path and resume its left to right journey. Again, when the echo is received the second pair of plates make the spot jump upwards. Instantly after this the spot returns to its former path and resumes its journey. Thus the complete picture is of a steady left to right journey with two upward jumps superimposed on it. Since the spot always starts moving from left to right just at the moment the pulse is being transmitted the first upward jump is always in the fixed position near the left of the tube, again since the journey of the pulse to the radio mirror and back takes the same time the second jump also occupies the same position the distance of which from the first upward jump depends on the time interval between transmission and reception. If we could follow the course of the spot we would have seen that the spot is describing the same path again and again. But its movement is far too fast for our eyes, what we see is a bright line stretching across the tube and two nicks on it. (*See* FIG. II). By choosing a suitable

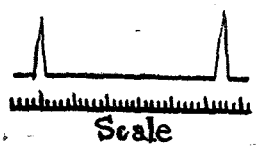

FIG. II

scale we can measure accurately the distance between the two nicks which represent some time and we can thus find the distance of the radio mirror. By applying this instrument Appleton discovered that there is another radio reflecting layer some seventy miles higher than the Kennelly-Heaviside layer. This new layer, named the Appleton layer, operates between sunset and sunrise and during that time the Kennelly-Heaviside layer gradually ceases to function.

The success in determining the distance of radio mirrors by the radio

sounding method led the scientists all over the world to think about the possibility of locating aircrafts by this method and from this followed the development of the Radar. For the detection of small objects like aircraft the radio pulses must be very short, short enough to distinguish between aircrafts flying within a few miles of each other. Another problem was also faced. The range could be determined by the C. R. T., but how to know the position?

In the Radar sufficiently short waves known as micro-waves are produced by a device known as "magnetron". The determination of the direction of the reflector is based on the fact that an aerial is most sensitive to radio signals coming in a direction at right angles to its length. This principle is employed in the construction of the P. P. I. (Plane Position Indicator) on which the exact position of the reflector is shown. The P. P. I. is nothing but a modification of the C. R. T. Unlike the C. R. T., the range is measured in the P. P. I. from the centre of the screen instead of from the extreme left of the tube. The electron beam moves like a hand of the clock on the screen as the swiftly revolving aerial receives the reflected rays. The beam also completes one revolution synchronously with one revolution of the aerial. The electron beam is normally made such that it is just weaker than the strength required to produce fluorescence. But when a reflected beam is received on the aerial it suddenly strengthens to cause fluorescence, and we see a blob of light on the screen. Just as in the C. R. T. the distance of the blob is measured by a suitable scale, but in the P. P. I. it is measured from the centre. The exact direction of the aircraft is determined from the direction at which the aerial was 'looking' at the time of reception of the signal. To facilitate the determination of the position of the plane quickly the screen is graduated in concentric circles representing the distance from the centre and the graduation of the compass shows the direction. The blobs have no special shapes to denote the things reflecting the waves, but the blobs can be interpreted in their true meaning by a trained operator.

The story of the incalculable service rendered by the Radar during the War is too long to be related here. Its service in fighting the air raid and U-boat menace, in locating the position of enemy targets, and, last but not least, its immense help in rescue work will be written in words of gold in the annals of the World War II. What is the exact future of the Radar we do not know. But it has already brought to the field of science not a few technical miracles. It has led to the development of calculating machines like the well-known "Eniac" which can multiply two ten-figure numbers in three-thousandth of a second. Another recent counting machine the A. C. E. (Automatic Computing Engine) has, besides the powers of the 'Eniac', a special power of 'memory' and it can remember no less than 75,000 digits indefinitely. Radar has come to the aid of meteorologists because rain clouds also reflect radio waves. During the War Radar units

were made small enough to be carried in aircrafts. These will enable ships and planes to proceed safely even in zero visibility and we certainly do not expect the recurrence of the 'Titanic' disaster. These are just a few of the hundreds of peace-time uses in which the Radar is now employed. Man has already begun signalling to the Moon and the Sun, and scientists predict that in near future man will be able to visit the Moon in Radar-guided planes. When is that day to come?

The Ideal of Sri Aurobindo

PROF. AMIYA KUMAR MAZUMDAR, M.A.

IT has been said that the ideal of Aurobindo is to divinise the human, immortalise the mortal and spiritualise the material. Attempts have been made to reach Life Divine, but they have proved futile because all of them are onesided. The Vedanta, for example, has failed because in it there is one-sided affirmation of spirit. The spiritualism which denies the domain of matter altogether is a false lead. The other extreme position is taken up by materialism which denies spirit. It requires little logic to show the inadequacy of materialism. For, even the primary perceptual knowledge shows that there is a transcendence of the senses, a reconstruction of the sense-material by thought. Materialism errs inasmuch as it takes a distorted view of things by reducing them to one dead level. In spite of its drawbacks materialism has done a service in calling attention to the fact that matter is the physical basis of our life.

A true philosophy therefore must avoid two extremes : materialism ignoring spirit and spiritualism ignoring matter. The result of separating matter from spirit has been disastrous. In one case spirit has been denied as an illusion, in the other matter has been declared unreal.

There is another method of approach which will lead us to Aurobindo's philosophy—a new philosophy of evolution. Hitherto some philosophers have looked upon evolution as a process which makes for upward progress. Aurobindo points out that evolution without involution is meaningless. For Aurobindo evolution stands for progress but at the same time it is the urge of divine realization. There is no denying that there is a gradual realization of higher and higher values in the scheme of evolution. Thus matter evolves into life and life into spirit. But that is only one side of the shield. Why does matter evolve into spirit? The answer is : because there has been an involution of spirit into matter. Aurobindo urges that without the descent of the Spirit into Nature there cannot be any ascent of Nature

to Spirit. Under the urge of the spiritual principle hidden within herself, Nature has brought forth matter, life and mind into being. And she has been conscious of her end in the human mind ; the mystery of Life Divine has been unravelled here for the first time. But human consciousness is not the last word in evolution.

The process of involution has been described in the following order: Existence, Consciousness-Force, Bliss, Supermind, Mind, Psyche, Life, Matter. The order of evolution will therefore be: Matter, Life, Psyche, Matter, Supermind, Bliss, Consciousness-Force, Existence. The first four constitute the lower hemisphere and the last four the upper hemisphere. The grades of the lower hemisphere constitute the subordinate forms of those in the upper hemisphere. As Aurobindo puts it, " Mind is a subordinate power of Supermind which takes its stand in the standpoint of division. Life is similarly a subordinate power of the energy aspect of Sachchidananda, it is Force working out form and the play of conscious energy from the standpoint of division created by Mind ; Matter is the form of substance of being which the existence of Sachchidananda assumes when it subjects itself to this phenomenal action of its own consciousness and force. "

The descent of Supermind into Mind and the consequent evolution of Mind into Supermind bring forth momentous changes. And this has been described by Aurobindo in the following words : " And this means the evolution not only of an untrammelled consciousness, a mind and sense not shut up in the walls of the physical ego or limited to the poor basis of knowledge given by the physical organs of sense, but a life-power liberated more and more from its mortal limitations, a physical life fit for a divine inhabitant and—in the sense not of attachment or of restriction to our present corporeal frame but an exceeding of the law of the physical body—the conquest of death, an earthly immortality. "

It follows from the above that our evolution to a higher stage does not imply that the higher stage is sundered from our body, life, soul or mind, it is rather a transformation of the lower stages. In fact, a lower mode of being has the higher at the back of it and the descent of the higher into the lower raises the lower into the creative movement from which the higher emerges.

Students of western philosophy will be reminded of Alexander's scheme of Emergent Evolution. It is interesting to note the affinity of thought between Aurobindo and Alexander. For Alexander space-time is the primal matter or matrix of all things. Objects of this universe are merely differentiations of this primal material. The empirical world rises from the primal background of space-time. Evolution proceeds under an immanent urge in this ultimate stuff. The lowest phase in the scheme of evolution is pure motion. Pure motion passes over into movement filled with matter and mechanical matter represents the first level of the world of experience. At

different stages new qualities are emerging. Matter is nothing but a configuration of motion or space-time. At a subsequent stage, life emerges out of matter ; it is not a by-product or epiphenomenon of matter. Mind emerges in a living organism of a higher degree of complexity. The mind is nothing but a system of conscious acts. But even in mind the *nisus* of space-time is present and the entire evolutionary process is tending towards a still higher stage, which is called Deity. The Deity of Alexander is, however, no infinite or divine being ; it is merely an empirical quality yet to be evolved. There is no actual God possessing Deity. God is merely the physical universe as tending to Deity. Although Aurobindo would agree with Alexander in so far as the direction of the evolutionary process is concerned, he will not look upon space-time as the ultimate matrix. For Aurobindo the significance of evolution cannot be realised at the very beginning of the process. The urge of evolution does not lie in matter or motion. Creation proceeds out of the delight of Supreme Consciousness.

It is to be noted that man's ascent to the higher mode of being opens out a spiritual experience in which duty and moral struggle are transcended and actions are done from an attitude of mind which is joyous, spontaneous and free. The spiritual ascent further implies that man has the power of transcending the limits of intellectual cognition. Intellectual cognition is separative ; it introduces a cleavage between the subject who undertakes an enquiry and the object of his contemplation. This separatist attitude fails to reveal the secret of the creative force that is immanent in experience as a whole. It further stands in the way of our realising integral knowledge inasmuch as it gives rise to a closed mind set up in opposition to Nature. Aurobindo therefore pleads for what he calls " knowledge by identity ". It is a form of knowledge in which the experience of knowing is identical with the experience or enjoyment of the reality known. To know God one has to be God. But this knowledge is hidden from us " by the distinction of oneself as subject and everything else as object, and we are compelled to develop processes and organs by which we may again enter into communion with all that we have excluded. " We can have a glimpse of knowledge by identity in the awareness of our own existence. As Aurobindo writes: " If we can extend our faculty of mental self-awareness to awareness of the self beyond and outside us, Atman or Brahman of the Upanishads, we may become possessors in experience of the truths which form the contents of the Atman or Brahman in the universe. "

It is because we are not fully alive to the significance of this spiritual knowledge that we fall victims to religious imperialism. It has been argued that there is an absolute opposition between the Personal or Determinate view of reality and the Impersonal or Indeterminate. For the Advaitin, for instance, Indeterminate or Nirguna Brahman alone is real ; everything else is unreal from the absolute point of view. It is argued that a modi-

fication is only a name and a form and that the basic energy alone is the truth. But Aurobindo condemns this attitude as partial. For the truth of modifications permeates the truth of the basic energy. Form and content cannot be sundered. Nor is form a figment of the imagination. It signifies some essential truth. If Ultimate Reality or the Absolute is to have any significance at all, we must conceive of it not only as the support or substratum of the universe but also as the essence and source of all determinations. It is true that the Absolute is indeterminable. But this negative epithet has a deeper positive significance. In fact, there is no opposition between the determinate and the indeterminate ; the one implies the other. Indeterminability and free infinite self-determination are complementary elements in the life of the Absolute. The opposition between an indeterminable Absolute and a universe of determinations is merely conceptual. Therefore it is wrong to look upon the universe as an illusory projection of the Absolute. Aurobindo writes : " An absolute, eternal and infinite self-existence, self-awareness, self-delight of being that secretly supports and pervades the universe even while it is also beyond it, is the first truth of spiritual experience. But this truth of being has at once an impersonal and a personal aspect ; it is not only Existence, it is the one Being absolute, eternal and infinite. " The Absolute is revealed as an Infinite of self-existence, self-awareness, and self-delight of Being. And this is revealed in knowledge by identity to which man's inmost self has access.

It may be asked: Is the ideal which Aurobindo holds before us realizable here and now? To the sceptic or any other person wedded to scientific knowledge the answer is surely in the negative. But Aurobindo has shown that scientific knowledge fails to convey the significance of the cosmic energy which pervades the whole of creation. As he puts it—" Our science itself is a combination, a mass of formulæ and devices ; masterful in the knowledge of process and in the creation of apt machinery, but ignorant of the foundation of our being and of world-being and it cannot perfect our nature and therefore cannot perfect our life. "

The ideal of Aurobindo therefore is not other-worldly. It has been affirmed that human life is not a preparation for soul's perfection in future life. Freedom is attainable here and now. And in the quest for freedom the claim of man's outer nature has not been brushed aside. Aurobindo is convinced that our outer nature can be divinely transformed. That is the goal of integral perfection. In a subsequent stage of evolution supermen would emerge out of the human race ; they would be spirits in the strict sense of the term and would be devoid of all bodily defects and deformities. In fact, their outer nature would be so transformed as to be fit media of spirit.

Whether we regard the spiritualisation of the entire human race as utopian or not the fact remains that Aurobindo has given us certain truths of experience which are too precious to be forgotten. These are firstly, his

insistence on integral experience, secondly the progressive nature of evolution and thirdly his claim that man's sense of values arises out of the creative power which is the fundamental character of the world as a whole.

Aldous Huxley

SUHRID PRASANNA MALLICK—*Third Year Arts*

I

THE modern world presents divergent elements in all the realms of activity that ultimately defy powers of unravelling. To-day mankind is torn between ideologies, and his perception of inward truth is obscured by a multiplicity of complex external phenomena. In the midst of these precarious social conditions, his mind is deeply assailed by a flux of ideas which has brought him into awareness of his significant social responsibility. This growing restless tendency has challenged the rigid moral earnestness of the past and the validity of Victorian conventions. Religion has been confronted by Science ; noble ideals have come into open conflict with practical necessity and a mechanical civilisation has been threatening to dispel the once persuasive 'sweetness and light.' A tremendous blow was given finally to dogmatized ideas by the First Global War which ruthlessly shattered pre-established values and brought in its train manifold problems,—economic, social and political. "Literature of security—of moral and intellectual security," the essence of literature in the Victorian era, was shattered. As a result of this world-wide devastation, man's sense of optimism became exhausted. A streak of pessimism and disillusionment has gradually crept into his mind. He has been made sceptical in his attitude towards this world. Aldous Huxley is the most prominent writer to give expression to this mood. He is the grandson of the eminent Victorian, Thomas Henry Huxley. It has aptly been said of him that "no British writer, in any period, has had such a formidable literary ancestry as Aldous Huxley." In fact, his life has been greatly influenced by three eminent Victorians—T. H. Huxley, Matthew Arnold and Mrs. Humphrey Ward.

II

"As Aldous Huxley looked out upon the nineteen-twenties, his attention was not engaged by the spectacle of social injustice, but by the flux of social relationships among supposedly cultured people." (*The*

Nineteen-Twenties: A. C. Ward ; p. 116). This is the cardinal theme of his writings which are revelations of demoralization and bankruptcy of spirit when a human being has become morally and emotionally banal. He has depicted some typical characters in his different works which are surcharged with deep pessimistic fervour. He has demonstrated with slashing satire the sharp crudities that underlie modern civilization. It is with a deep penetration into human psychology that he has unravelled the seamy side of human life. This sort of negative attitude towards life is not the outcome of morbid nihilism, but is founded on the present social crisis. His is a technique which marked a sharp break with the Past, a daring use of images drawn from the myriad aspects of the matter-of-fact life of the Present. In his *Antic Hay,* human beings, indeed, are lost in ' antics.' As the political and social crisis deepened, he became more sceptical about the future of mankind. In *Point Counter Point,* he has held forth with ' cold vitriolic savagery ' and according to Mr. Ward, " On the evidence of this one book, it might be said that Aldous Huxley is the most shattering satirist in English literature since Swift." (*The Nineteen-Twenties ;* p. 117). In it he has vividly rendered the crisis in the realm of morality with a brilliant analysis of the present social system. But in *Brave New World* he has horribly anticipated a ' new world ' where laboratory-produced creatures, who are machine-rolled, perform the worldly activities in a spurious mechanistical manner. In his *Time Must Have A Stop,* he has chalked out a new thesis for the regeneration of mankind. According to him, we must sacrifice the routine-bound Time to Eternity, otherwise we cannot aspire to advance towards peace, prosperity and progress. It is interesting to note that the forecast of an eminent critic that " by the end of the nineteen-twenties he had sunk into settled dispair about his own generation " has come to be true in his *Ape and Essence.* The tale unveils before our eyes a most frightful picture that paints with a merciless brush the unthinkable moral and material calamity to which mankind is destined to succumb. It is a warning to mankind through a most appalling tale about the future of the world if we go on committing blunders and faults. The tale is in the form of a film script, suddenly discovered in a Hollywood dustbin, the author of which sets out to give a possible picture of California after a Third World War. He has given a lurid picture of the havoc wrought by atomic and bacteriological warfare, which is succeeded by a most horrible moral disaster to mankind. People begin to worship Belial—the incarnation of Evil ; the principle of good loses all meaning to them. In this context, it is quite in the fitness of things that Huxley blandly asserts, through the lips of the Arch-Vicar, that "the only plausible explanation is that they were inspired or possessed by an alien consciousness, a consciousness that willed their undoing and willed it more strongly than they were able to will their own happiness and survival" (p. 95). Huxley finds 'Progress' and 'Nationalism' to be the two

fatal conceptions that produce the present anomaly in human civilization. Delving deep into the problem, he comes to this conclusion:

> "..... proud man,
> Drest in a little brief authority—
> Most ignorant of what he is most assur'd,
> His glassy essence—like an angry ape,
> Plays such fantastic tricks before high heaven
> As make the angels weep" (p. 25)

He has maintained the same verve in his recent book *Themes and Variations*. If the human race does not decline because of its spiritual perversities, it is, nevertheless, doomed to melancholy eclipse. The constantly diminishing natural resources of our planet, soil erosion, and the expanding population of Asia, will have combined to make the world no place to live in. According to him, when he glances at the various ailments of contemporary civilization "in toto" he finds "the case" to be incurably hopeless. He asserts that "many of us are chronically sick and more or less gone in neurosis." It is also true that a man living in the twentieth century is "rather more likely to develop cancer, diabetes, and the varieties of psycho-somatic disorders". Again , "every efficient office, every up-to-date factory is a panoptical prison.....". This is a bird's-eye-view of modern activity as seen by Huxley, according to whom "in the high vacuum of the modern world not a trace of the divine or the eternal remains and the notions of State, Nation and Party are therefore free to expand into vast and monstrous caricatures of God". His contention is that the prospect of mankind is gloomy. However, he endeavours to deflect what is best in him from the stampede of damnation and destruction, and his final verdict is this: "The evil that men do lives on ; the good is oft interred with their bones."

III

The fact is that there is a fundamental difference between the past and present writers in their attitude to the objective world. Civilization is at a crisis and many forces are at work to menace our cultural heritage. Amidst these dark clouds Huxley finds no silver lining. Modern world conditions give a more rationalistic outlook than the past and "circumstances have led humanity to set an ever-increasing premium on the conscious and intellectual comprehension of things. Modern man's besetting temptation is to sacrifice his direct perceptions and spontaneous feelings to his reasoned reflections ; to prefer in all circumstances the verdict of his intellect to that of his immediate intuitions" (*Do What You Will*). This is more or less a generalization of Huxley's code of beliefs. "The spectacle of a society," as a critic says, "withering in a desert of make-believe and joyless gaiety, served numerous novelists and dramatists in the nineteen-twenties and nineteen-thirties with material they turned to gruesome use." Aldous Huxley

is pre-eminently the representative of this school of thinking men who find any puritanic notion in the context of modern life to be entirely joyless and sterile ; rather they possess more faith in this objective material world. The craze of humanity for *El Dorado* even through the soul's disintegration, is to Aldous Huxley an insane incentive. "In relation to the society in which he lives he is of course sane ; for he resembles the majority of his fellows. But they are all, absolutely speaking, mad together" (*Proper Studies*). In this way, Huxley has logically come to this final conclusion: " One thing alone is absolutely certain of the future: that our Western societies will not long persist in their present state. Mad ideals and a lunatic philosophy of life are not the best guarantees of survival." (*Proper Studies ;* p. 271). Present-day society as a whole with the curious incongruousness of its components, defies any synthetic approach towards the solution of this problem. So far as Huxley is concerned, he has not been able to lay down any path for the redemption of doomed humanity. In his *Note on Eugenics,* his firm conviction is this: "The best is ever the enemy of good. If the eugenists are in too much of an enthusiastic hurry to improve the race, they will only succeed in destroying it". (*Proper Studies* ; p. 282). From his *Grey Eminence* up to *Time Must Have A Stop* Huxley has harped on the same fact that whatever attempts are made to bring about "a change in individual human nature or a change in the character of society as a whole", it is sure to result in an inglorious fiasco. Therefore, like Blake, Huxley might say :

"Do what you will, this world's a fiction
And is made up of contradiction."

Yet, of late, with increasing political and social complexities Huxley has sought refuge from them in a philosophy—the Perennial Philosophy like Leibnitz's *Philosophia Perennis.* It is the ' highest common factor ' of all philosophies of all countries and of all ages and this alone can soothe the mind that is paralysed to-day. Though once he maintained that "the Ideas of Plato, the One of Plotinus, the Alls, the Nothings, the Gods, the Infinites, the Natures of all the mystics of whatever religions, of all the transcendental philosophers, all the pantheists—what are they but convenient and consoling substitutes for the welter of immediate experience, home-made and therefore home-like spiritual smuggeries in the alien universe," his lyrical escape to philosophy has its origin in his frantic effort to get down to the real truths in the "welter of immediate experience."

To-day when the human soul is on a sharp razor's edge with absolute loss of creative faith, Huxley's yearning for the salvation of mankind has a special meaning. A way must be found to turn chaos into cosmos, to evaluate man's manifold precious qualities, which, unfortunately, Huxley does not take into cognizance. In this respect, Joseph Needham, a scientist and a contemporary of Huxley, makes an interesting contrast. He says, "The message will reach those for whom it is intended surely enough by way of the

popularising pulpits and microphones. Aspire to sainthood, they will say, and always remember that saints like scientists, must keep out of politics." (*History is on our Side*). Unlike Huxley who has demanded that "time must have a stop", Needham sees 'time' to be "the refreshing river." To Needham, "contradictions are not resolved only in heaven ; they are resolved right here, some in the past, some now, and some in time to come. This is the dialectical materialist way of expounding cosmic development, biological evolution and social evolution, including all history." Opinions differ, as has always been with philosophical questions, but the conflicting ideas do evince the crisis in the modern spirit. Huxley has seen life not from an 'Ivory Tower' and any assertion that under all circumstances the artist should not fail to reveal beauty and dignity of life may be construed as 'escapism'. But to accept only the darker aspect of life, is also a sort of 'escapist' attitude, as E. M. Forster wrote: "There are two chief reasons for Escapism. We may retire to our towers because we are afraid..... But there is another motive for retreat. Boredom, disgust, indignation against the herd, the community, and the world ; the conviction that sometimes comes to the solitary individual that his solitude gives him something finer and greater than he gets when he merges in the multitude..... The community is selfish and to further its own efficiency, is a traitor to the side of human nature which expresses itself in solitude. Considering all the harm the community does to-day, it is in no position to start a moral slanging match..... We are here on earth not to save ourselves and not to save the community, but to try to save both". Perhaps, this is a synopsis of art's relation of life, but in Huxley's writings which are so deeply soaked in the sap of real human life there is always this mature opinion hinted at, that a more desirable way of life exists and that is to be explored forthwith. So he is in a sense a non-decadent writer and a moralist too ; he is more susceptible to Realism and less sensitive to Romanticism and does not paint the bare facts of life with a fine polish and false glamour. T. H. Huxley once wrote that he learned when a boy "to make things clear and get rid of cant and shows of all sorts" and that is fully reflected in his grandson's works, devoid of any 'cant' and 'shows'.

Huxley to-day takes refuge in the placid serenity of nature in a beautiful shelter in South America. He is nevertheless deeply concerned, deeply melancholy about the impending doom of this civilized humanity. To-day as he, with his tenacious adherence to his pre-conceived belief, casts his 'lingering look' at the torpor that has seized mankind, he holds out this final truth that he has perceived all through his life : "I insist that politics are never enough, and that the human problem is insoluble unless it be attacked simultaneously on all its fronts—the personal front as well as the political, the religious and philosophical as well as the economic." Aldous Huxley flings a challenge to humanity. In a timely response to this challenge lies the salvation of mankind.

The Significance of Bernard Shaw*

PROF. S. C. SEN GUPTA

WHEN Shaw was alive, his critics tried to cry him down by saying that he was too much concerned with contemporary propaganda to be able to enter the realms of art which creates changeless forms. Shaw half jokingly retorted that although others might ride the high horse of literature he was content to be a mere journalist. But he slyly added the rider that all great artists, Aeschylus downwards, had treated of contemporary themes, and that is why Shakespeare peopled Athens with Elizabethan mechanics. In his last testament he seems to have made a concession to his old critics by wishing to be forgotten. What posterity will say of Shaw it is for posterity to decide. It is for us to take stock of what he has meant for the modern world which, if we may use a hackneyed phrase, he bestrode like a colossus for more than half a century.

I

First and foremost, he made no distinction between art and propaganda, thus cutting at the roots of the traditionally accepted theories of art for the sake of art. The typical literary critic would say that art is the creation of beautiful forms, that even if there were ideas in art they are no more than materials which the creative artist will mould and transform just as he moulds and transforms his other materials—words, paints, marble or sounds. Indeed, for these critics the highest form of art is music where form dominates content and words are denuded of meaning. They look upon the mixing up of philosophic interpretation with aesthetic interpretation as illegitimate. For them art is pure image-making, pure expression. Everything else is supernumerary.

It is one of the achievements of Shaw that he gave a blow to this theory from which it has not been able to recover. He made the world alive to the richness of the content of art. Indeed, when he drew a distinction between form and content, he went to the opposite extreme and showed that the form of Shakespearian drama, divorced from its content, would be nothing but the mnemonic beauty of the verses. Poetry and art may be image-making, but image-making of what? If Candida is different from Desdemona and Mrs Warreen from Doll Tearsheet, it is because they are the creations of authors whose philosophies of life are at the opposite poles. The Cleopatra of Shaw's play has only a faint resemblance to Shakespeare's serpent of old Nile, though both are based on the Cleopatra of history and legend. Is

* Read before a meeting of the P. E. N. (Calcutta Centre).

this difference qualitative or quantitative? Assuming that both Shakespeare and Shaw had the image-making power of the artist, how can we explain the difference except with reference to their attitudes to life in general and to womanhood in particular?

II

Shaw is responsible for yet another striking innovation in the domain of aesthetics. From one point of view he is a freak of nature, as all men of genius are. He is terribly in earnest and yet a tremendous trifler. Tolstoy complained against him that he wanted to make of life a joke, and he retorted that he wanted to make it a good joke, thereby revealing his serious purpose which, strangely enough, re-inforces rather than impede his laughter. He has opened our eyes to the gloomier realities of life—slum landlordism, prostitution, sex-jealousy, and yet his attitude is never tragic. He has linked propaganda to comedy and made laughter serious. He has himself said that his plays are *sui generis ;* they are neither tragedies nor comedies. In *Saint Joan* he treats of death, but he takes the sting out of it by making Joan's persecutors rational, sensible, fair-minded judges and by the trick of an epilogue which depicts the spiritual resurrection of the martyr.

Orthodox critics protest against Shaw's making short work of what they call plots. It is difficult for them to take as full-fledged human beings characters whose only business is to talk and talk. But there are lengthy speeches in Shakespeare's plays as much as in Shaw's, Rosalind argues as much as John Tanner, and as for plots, there is very little of it in post-Ibsenist drama, and Shaw cannot be held to be the only sinner. Shaw's real departure from traditional modes of playwriting is not that he has given thin plots and garrulous heroes and heroines, but that he has freed drama from the dichotomy of tragedy and comedy and written plays in which there is not merely the mixture of laughter and tears as in Shakespeare's plays or the novels of Dickens but in which the comic and the serious have blended to make a new *genre* of art.

And behind this new *genre* there is a new attitude to life, which is scientific and humanistic. It is humanistic because it treats of the evolution of man from his earliest days upto *As Far As Thought Can Reach,* from Lilith, the parent of Adam and Eve to the distant future when man develops into an Ancient. It is scientific because it looks upon man as he has been, as he is and as he is likely to be. This attitude takes note of instincts rather than sentiments, and although it is idealistic, the ideal is implicit in the real. There is hardly any passage in literature more passionate than Don Juan's exposition of the creed of the Life Force but it is as coolly reasoned out as any theory in a scientific text-book. But no amount of ratiocination can explain why the living should emerge out of the non-living, why the protoplasm should develop into the philosopher, why there should

be any movement at all. Here Shaw, the mystical idealist comes to the aid of Shaw, the scientific thinker. It is the urge for evolution, the inner impetus to look beyond oneself, the necessity for achieving more and more self-knowledge and self-control that can alone explain the riddle of life. It is part of the paradox of Shaw that no one has applied reason more relentlessly and yet no one has trusted reason less.

III

It is this peculiar synthesis of mysticism and rationality that is reflected in the many plays which are the foundation of Shaw's fame. His attention has been drawn especially to two important aspects of human civilization—the distribution of wealth and the relations of the sexes. He has shown that what we miscall our morality and our religion are really expressions of something which has nothing to do with either—private property and with it the ideal of monogamic marriage, and unless these are changed there can be no talk of morals or religion. That is why all our tragedies have appeared to him to be farces and all our ideals only hoaxes. It is only when socialism has killed the individual's urge for private gain that real individualism can emerge. Till then all our individual emotions and virtues—love, courage, charity etc. will remain unreal, and this realization is one of the secrets of Shaw's laughter.

Another secret of Shavian comedy is the new attitude to sex. For Shaw sex is the most deadly and most necessary of instincts but it is the most transient of them all. Its grip may be terrific; it may be compared to a boa-constrictor. But there is no ground for founding any permanent relationship on it. That is why his attitude to sex is both serious and comical; the typical Shavian lover is as far from Othello as from Falstaff.

Life has its larger purposes and the individual is only the instrument of these purposes and also their martyr. The hero is not one who is the slave of passions which derive their force from conventional ideas but the man who can direct all his passions to serve his deeper purposes which are also the purposes of the Life Force. Such heroes are Julius Cæsar, Napoleon, Captain Bluntschli and such a heroine is Saint Joan. Whatever may the value of Shavian philosophy and aesthetics be, it cannot be denied that most of his creations are original not merely in the sense that they are unlike other characters in history and fiction but also because they have the mysteriousness and the unpredictability which are the hall-marks of living men and women. Shaw himself once said that when he set about writing a play he started with certain notions but as soon as the play was half way through the characters began to have a life of their own and he had no more control over them than over his wife. That is the ultimate test of art. His plots may be thin, his dramas may be propaganda but his characters *live*.

IV

But do they live in the same way in which the greatest creations of literature live? Can we class any of his characters with Hamlet, Macbeth, Don Quixote, Pickwick and Abbé Coignard? That is a question on which a Shavian will feel diffident. It is not that he has sacrificed art to propaganda, but his creations are lacking in complexity and richness. Not that they fail in vitality, but they fail in variety. The heroes are marvels of self-possession, but they seem too easily to subordinate instincts to what may be called utilitarian considerations. And then what right have we to think that Bluntschli's romantic disposition is less an external urge than Hamlet's conscience or Macbeth's cupidity?

This weakness is felt even more in Shaw's women than in his men. Shaw has been called the Father of the Flapper ; no one has more ardently championed the cause of woman, but almost all his women are lacking in subtlety and grace. Joan of Arc is more of a person than a woman. A woman, Shaw would argue, is just the female of the human species. But have we any right to think that the females of animals are as undistinguished to them as to us? Can a he-tiger play a cat and mouse game with a she-tiger just as Bluntschli does with Raina? Shaw claimed that his Cæsar was an improvement on Shakespeare's—Shakespeare's Cæsar as well as Shakespeare's Antony. But what about Cleopatra? Shaw's Cleopatra is only a morsel for a monarch ; she has not even a fraction of the infinite variety and charm of Shakespeare's heroine. Indeed, Shaw's kitten is less than a shadow of the Cleopatra of legend and history, who spoke ten languages and surpassed all the other Ptolemies in luxury and learning. One instance would suffice to show Shaw's inability to grasp the intricate intensity of her character. At Alexandria Cæsar and his generals had decided on taking up the cause of Ptolemy XIV when a Greek merchant came into the Council Hall with a present of rugs, and out of the bundle emerged Cleopatra, the most wonderful of women, who held Cæsar spell-bound and made the Council reverse its decision. In Shaw's play this incident is only a joke, and Cleopatra's triumph is turned into defeat. This travesty of history marks Shaw's limitation as an artist.

In a world of men Shaw is the nearest approach to the Superman whose advent he forecasted. He has given us a new aesthetics and prepared the way for a new set of moral values. Even if time takes away the touch of novelty from his ideas and his parodoxes become platitudes, there is the enduring monument of his dramas, which, it may be hoped, will secure for him a place among the Immortals. These dramas show how ideas can be endowed with life and the Shavian hero and heroine will continue to take their place beside other great creations of art. It is true, indeed, that his portraiture is often over-simplified ; but that is because he wants to divest instincts of all sentimental accretions, and what is lost in complexity and variety is gained in novelty and originality.

A Week of Historical Conferences at Cuttack

PROF. CHARU CHANDRA DASGUPTA, M.A., PH.D. (Cal. *et* Cantab)

The Indian Historical Records Commission, the Indian History Congress, the Numismatic Society of India and the Museums Association of India held their sessions at Cuttack from the 24th to the 28th December, 1949 under the auspices of the newly founded Utkal University.

This week of historical conferences at Cuttack started with the opening session of the Indian Historical Records Commission on the 24th December, 1949. All the delegates and members were welcomed with a short address by Maharaja Sir Gajapati Narayan Rao of Parlakimedi, Chairman of the Reception Committee. After the delivery of the presidential address His Excellency Mr. Asaf Ali delivered the inaugural address. Here he said that ever since the dawn of intelligence attempts were made by man in ancient Egypt, China, Persia, Babylonia, Assyria, Chaldea, Greece, Rome and India to correlate the functioning of his species to the Infinite Timeless by dipping as deep into his imagination as his knowledge permitted him to do from time to time. He referred to the possibilities of further research in the ancient history of the world. He suggested that ways and means should be devised to recover the records scattered all over India and the world.

The authorities of the Indian Historical Records Commission organised an exhibition of historical records. The exhibits included documents, inscriptions, manuscripts, Firmans, paintings, coins, records, copper plates, sanads, palm-leaf painting maps and books.

The 12th Indian History Congress started its deliberations on the 26th December. Sri C. M. Acharya, Vice Chancellor of the Utkal University and Chairman of the Reception Committee, delivered a brief address. In it he referred to the historical materials of Orissa, to the important historical monuments at Cuttack and also to the importance of Madle Panji written at the command of King Ananga Bhima Deva. The welcome address of Sri Acharya was followed by the inaugural address of Pandit Lingaraj Misra, Minister of Education to the Government of Orissa. He referred to the cultural heritage of Orissa. Then he spoke about the revolution in Indian historiography in the middle of the 19th century due to the contact of Indians with the Britishers.

Then Dr. Ram Prasad Tripathi, Professor of History in the University of Allahabad, delivered his general presidential address. He said that historical studies in India were almost wholly confined to Indian history with the result that the study of history of other countries of the world was sadly neglected. Then he gave an exposition of modern historiography. In the beginning its chief characteristics were the desire to overthrow religion and study every aspect from the point of view of human reason. The rationalists' self-assertive consciousness led them to think that before the 18th century the world was steeped in superstition and darkness, and their attitude to ancient and mediaeval histories, therefore, became warped. They were corrected by the Romanticists headed by Rousseau. Green and Jansen propounded the theory that the history of the people was the main theme of historiography. The goal was to discover the truth with perfect indifference to the likes and dislikes of others. He spoke about the trend of historiography in India and made suggestions to improve the tone of historical studies and scholarship in India.

The Indian history congress was split up into six sections. Section I was presided over by Dr. V. S. Agrawala. In his presidential address he laid emphasis on the phenomenon of cultural synthesis which he considered as the thread of Indian culture through the ages.

The president of Section II, Dr. D. C. Ganguly, endeavoured to prove that the Rajputs were indigenous people like the Rashtrakutas, Palas, Senas etc.

The president of Section IV, Dr. K. R. Kanungo, said that the ancient Orient had its own conception of history and mode of presentation.

The president of Section V, Dr. N. K. Sinha, dwelt particularly on the problem of rewriting modern Indian History. He emphasized the irreparable damage that had been done by the over-simplification of history.

The president of Section VI, Sri H. K. Mahtab, then Premier of Orissa, said that it was necessary to collect all historical materials about Orissa.

There were altogether 101 papers for reading and discussion at different sections.

Inangurating the annual meeting of the Numismatic Society of India Sri H. K. Mahtab said that numismatics had great potentialities of revealing some important links still missing in the past history of India. In his presidential address Dr. J. N. Banerjee said that a close study of the different groups of the pre-Muhammadan coins threw an interesting light on their manufacturing tendency in ancient and mediaeval India, that some mediaeval gold coins of the south preserved the method as used in the minting of the punch-marked coins.

In the annual meeting of the Museums Association of India, Dr. N. P. Chakravarti, Director General of Archaeology in India delivered an interesting presidential address on Indian Museums and their place in the scheme of education. He said that there should be a number of national museums throughout India as they were absolutely necessary for the education of the people.

The authorities of the Indian History Congress also arranged a number of illustrated lectures—(1) Excavations at Sisupalgarh, (2) Orissa Temples, (3) Archaeology and two Brahminical cults and (4) Satavahang art.

There was also an interesting symposium on the cult of Jagannath which was started by Sri H. K. Mahtab.

It was decided that delegates would be taken round the important archaeological sites which were abundant in Orissa. The caves of Udayagiri and Khandagiri are Jaina monasteries or *Viharas*. One famous cave in this group is the Hathigumpa where the wellknown inscription of Kharavela, the king of Kalinga, is found.

Many scholars have studied the ancient temples of India and have concluded that there were three different types of temples in ancient India *viz.* (1) Northern, (2) Central and (3) Southern.

Scholars have studied all the temples of Bhubaneswar from the standpoint of evolution and have come to the conclusion that they are to be referred to the period from the 8th to the 13th centuries A.D. All these temples are Saiva. The characteristic features of these temples are *sikhara, amalaka* and *kalasa*. From the standpoint of style there is probably a connection between the Bhubaneswar group of temples and the temples of Java.

Colossal sculptures are among the noteworthy features of the Kanarak temple which was, according to the opinions of scholars, built between 1238 and 1264.

The archaeological remains which had been excavated at Sisupalgarh show that Sisupalgarh is a ruined city site. According to the opinion of a number of scholars this was probably the capital of Kharavela.

The English Seminar

The English Seminar held two meetings to commemorate the death centenary of Wordsworth during the present session. Dr. Srikumar Banerji, who addressed the first meeting, spoke at length touching all sides of the poet's genius and laid stress on the true nature of Wordsworth's romanticism. Dr. Saroj Kumar Das, the head of the department of philosophy, spoke in the second meeting. He pointed out how poetry and philosophy meet in the personality of the poet-philosopher, Wordsworth.

In the only other meeting held apart from the two Wordsworth meetings, Miss Anshu Mitra De's (6th year) paper entitled "The Dramatic Medium: Prose versus Verse" was read.

A number of new books have been added to the Seminar Library during the current session. We are thinking of adding more.

RAMENDRA NATH RAY &
BINOD KISHORE ROY CHOUDHURY.
Joint. Secys., Eng. Seminar.

Book Reviews

INDIA'S NEW CONSTITUTION: H. N. Banerjee, M.A., B.L., B.C.S. (Retd.). Published by M. C. Sarkar & Sons Ltd., Calcutta, P. 173. Price Rs. 3/-.

Mr. Banerjee, a scholar of repute and author of many books of invaluable help to students of civil, criminal and constitutional law, presents within a short compass all the numerous and complicated provisions of our constitution in several well-arranged and nicely written chapters.

The author does not enter into the lacunae in our constitution or into the various possible interpretations that its different articles may bear. But this does not derogate from the value of the book which is an analytical abstract of our bulky constitution written in quite a readable style. There are a few printing mistakes and two errors of judgment. On page 53 Mr. Banerjee writes that the phrase "except according to procedure established by law" in Article 21, instead of "without due process of law", unduly restricts the authority of the courts and is "thus an obstruction to the rule of law". Sir B. L. Mitter inclined to this view and Justice Das of the Supreme Court (in Gopalan's case) also spoke of "legislative tyranny". But on a critical reconsideration, this view does not seem to be tenable, for in England, the rule of law is not obstructed by the sovereignty of the Parliament. Our Parliament is less sovereign than the English, and hence our Courts have greater powers than those of the U.K. They can declare an Act of the Parliament unconstitutional, if it violates the written constitution or imposes restrictions on individual liberty which do not appear to the Court to be "reasonable". British Courts do not enjoy similar rights. Secondly, if our Courts had been given absolute supremacy over the legislature, as in the U.S.A. the tempo of social re-organisation might have been slowed down. For, the Courts cannot create new laws or prescribe new social rules, their function being

to apply the laws as they are, while in a country in the process of rapid social transformation, or, as the French say, "an plein revolution", what is necessary is a body of new laws to make such transformation peacefully effective. While the courts are the best safeguards of liberty, they are unable to enlarge the sphere or enrich the contents of liberty. This can be done only by the legislature.

On page 65, Mr. Banerjee writes that the President "may withhold his assent from all Bills other than Money Bills". In fact, Money Bills are no exceptions ; only, the President cannot return them to the Houses for reconsideration.

However, as no book on the Indian Constitution yet published is without a few mistakes (even Dr. N. C. Sen Gupta's suffers from several—see his interpretations of Art. 53 (3) (b) and Art. 131 (b), (c), in p. 63 and p. 143, respectively, of his "The constitution of India"), the book under review can be safely recommended to the students.

RAMESH CHANDRA GHOSH

AT THE CROSS-ROADS: Prof. Nripendra Chandra Banerjee. Published by A. Mukherjee & Co., Ltd., College Square, Calcutta. Price Rs. 8/-. P. 318.

This autobiography of Prof. Nripendra Chandra Banerjee, the famous "Master Mahasaya" of Bengal, is an interesting record of the origin, development and partial fulfilment of the numerous social, political and cultural forces that made the history of India during the last half-a-century. Prof. Banerjee was born in Vikrampur in the very year of the birth of the Congress (1885). He studied the B.A. in the Presidency College, got his M.A. in 1905 and began his career as a Professor of English Literature in July 1906 by joining the B. N. College, Patna. He served many colleges, including ours, in succession and after fifteen years of Government service, resigned in March 1921 in pursuance of the clarion call of our Motherland and plunged headlong into the national struggle. He served the country in various capacities as a member of the Congress, a journalist, a social and political worker popularising khadi, organising national education, addressing the people from All-India and Provincial Congress platforms, promoting rural development and suffering imprisonment for several years for the crime of patriotism.

In 1940 Prof. Banerjee retired to his rural retreat "Palli Madhu" at Baidyabati where he breathed his last on 18th August, 1949 after having the satisfaction of seeing his beloved motherland freed from the fetters of foreign rule.

In this autobiography there are several bright pen pictures of Vikrampur, Rajsahi, Krishnagar, Chittagang and beautiful character sketches of some of the great men of India of his time, including Mahatma Gandhi, Subhas Bose, J. M. Sen Gupta, Prof. Andrews, Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore and others. Prof. Banerjee has written his life history in a very crisp and almost poetic style which unmistakably shows what a rich, highly sensitive and intellectually alert mind his was. His varied experiences and recollections he tells us not merely as a detached onlooker of the great events of his time, but as a considerable actor in the great drama of our national liberation. In him we find a happy blend of Tilak—Pal—Aurobindo real-politiks, Tagore's idealism and Gandhi's mysticism. The book is a valuable contribution to the social and political literature of India and deserves to be read by every lover of India.

RAMESH CHANDRA GHOSH

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

1914-15	Jogesh Chandra Chakravarti, B. A.
1915-16	Prafulla Kumar Sircar, B. A.
1916-17	Prafulla Kumar Sircar, B. A.
1917-18	Rama Prasad Mukhopadhyay, B. A.
1918-19	Mahmood Hassan, B. A.
1919-20	Paran Chandra Gangooli, B. A.
1920-21	Shyama Prasad Mookerjee
1921-22	Bimal Kumar Bhattacharyya
1921-22	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Akshay Kumar Sircar
1923-24	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Bijoy Lal Lahiri
1926-27	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Sunit Kumar Indra
1928-29	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Ajit Nath Roy
1930-31	Ajit Nath Roy
1931-32	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Provat Kumar Sircar
1936-37	Arun Kumar Chandra
1937-38	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	Bimal Chandra Datta, B. A.
1940-41	Prabhat Prasun Modak, B. A.
1941-42	Golam Karim
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	Jibanlal Dev
1947-48	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Sourindra K. Chakrabarty

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15 Pramatha Nath Banerjee, B. A.
1915-16 Mohit Kumar Sen Gupta, B. A.
1916-17 Mohit Kumar Sen Gupta, B. A.
1917-18 Saroj Kumar Das, B. A.
1918-19 Amiya Kumar Sen, B.A.
1919-20 Mahmood Hassan, B. A.
1920-21 Phiroze E. Dastoor, B.A.
1921-22 Syama Prasad Mookerjee B. A.
1921-22 Brajakanta Guha, B. A.
1922-23 Uma Prasad Mookerjee
1923-24 Subodh Chandra Sen Gupta
1924-25 Subodh Chandra Sen Gupta, B. A.
1925-26 Asit Krishna Mukherjee, B.A.
1926-27 Humayun Z. A. Kabir, B. A.
1927-28 Hirendra Nath Mukherjee, B. A.
1928-29 Sunit Kumar Indpa, B. A.
1929-30 Taraknath Sen, B. A.
1930-31 Bhabatosh Datta, B. A.
1931-32 Ajit Nath Roy, B. A.
1932-33 Sachindra Kumar Majumdar, B. A.
1933-34 Nikhilnath Chakravarty, B. A.
1934-35 Ardhendu Baksi, B. A.
1935-36 Kalidas Lahiri, B. A.
1936-37 Asok Mitra, B. A.
1937-38 Bimal Chandra Sinha, B. A.
1938-39 Pratap Chandra Sen, B.A.
1938-39 Nirmal Chandra Sen Gupta, B.A.
1939-40 A. Q. M. Mahiuddin, B. A.
1940-41 Manilal Banerjee, B. A.
1941-42 Arun Banerjee, B. A.
1942-46 No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47 Sudhindranath Gupta, B. A.
1947-48 Subirkumar Sen, B. A.
1948-49 Dilipkumar Kar, B. A.
1949-50 Kamalkumar Ghatak, B.A.

Printed by P. C. Chatterjee at the Modern Art Press, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta.
Edited and Published by Kamalkumar Ghatak, Presidency College, Calcutta.